চলার পথে

জগদানন্দ বাজপেয়ী

প্রসাদী সাহিত্যসত্র
১/২/৭, দমদম রোড, কলিকাতা—২

প্রকাশ করেছেন :

শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার

প্রসাদী সাহিত্যসত্র

১।২।৭, দমদম রোড, কলিকাতা—২

⊙

প্রথম মুদ্রণ, ভাদ্র, ১৩৫৯

⊙

মূল্য—তিন টাকা

⊙

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা করেছেন :

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

⊙

ব্লক ও প্রচ্ছদপটে :

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

৭২/১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

⊙

ছেপেছেন :

শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল

কল্পনা প্রেস

৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬

⊙

বেঁধেছেন :

ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

১০০, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৯

বন্ধুবর—

শ্রীগৌতম সেন

করকমলেষু,

প্রিয় বন্ধু,

কতদিন কথাপ্রসঙ্গে জীবনের অতীত ইতিহাসের যুগ-জীর্ণ-পাতা থেকে আহরণ ক'রে এনে কত কাহিনীই আপনাকে শুনিয়েছি। ভেবে'ছিলাম, সে-সব কথা কালের স্রোতে ভেসে গিয়ে কোন অকূলে হারিয়ে ফেলেছে আপনাদের। সেদিন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, সে-কাহিনীর কোন দিন আমাকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে কাগজের পৃষ্ঠায়। তাই 'সৈনিকে' আমার আত্মকাহিনী লিখবার তাগিদ্ যখন এলো আপনার কাছ থেকে আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, আমারো অতীত এমন্ কোন জীবন আছে নাকি যা পাঁচজনেব কাছে খুলে ধরবার যোগ্য! সে জীবনে আবার এমন কোন কাহিনী আছে নাকি যা পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মত! তার জবাবে অতীতের কথিত দুই-একটি কাহিনীর কলি দেই আপনি কূজন করে উঠলেন, অমনি তার আঘাতে সুর বেজে উঠলো স্মরণ-বীণার তারে তারে, আপনারি বাজানো সুর কথায় ঢেলে আজ আপনারই হাতে অর্পণ করছি ঠিক তেমনি করে বাঁশী যেমন বাতাসের প্রেরণায় বেজে উঠে বাতাসের বুকেই বিলিয়ে দেয় তার সুর।

ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ—

জগদানন্দ বাজপেয়ী

প্রকাশকের নিবেদন—

প্রসাদী আমার মায়ের শুভ নাম। মায়ের স্মৃতি-রক্ষা কল্পে এই সামান্য সাহিত্যসত্র খুলিয়াছি।

এর দ্বারা যদি একজনও সাহিত্য-পথ-যাত্রীর তৃষ্ণা দূর করিতে সক্ষম হয়, আমি এই সান্ত্বনা পাইব যে আমার মায়ের আত্মা তৃপ্ত হইয়াছে।

ভূমিকা

'চলার পথে' যখন ধারাবাহিক 'দৈনিক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন পাণ্ডুলিপি কম্পোজিটরদের হাতে যাবার আগে, আমরা সকলে মিলে পড়তাম, পরবর্ত্তী অংশের জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতাম। শ্রোতারা সকলেই বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শুনতেন। তাঁদের মধ্যে, স্বভাব-দোষে, আমি উল্লাসে চীৎকার করতাম। সেই জন্যে আমার ঘাড়ে এই ভূমিকা লেখার দায়িত্ব এসে পড়ে। দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি, এই জন্যে যে, এর সঙ্গে যে-গৌরব জড়ানো রয়েছে, তার মূল্য আমার কাছে কম নয়।

সাহিত্যের আসরে, মাঝে-মধ্যে, অকস্মাৎ এমন এক-একটী বই-এর আবির্ভাব ঘটে, যা কারুরই পরিচয়-ভূমিকার অপেক্ষা রাখে না। আগন্তুকের মত সে আসে, গৃহস্বামী হয়ে থেকে যায়। 'চলার পথে' সেই জাতীয় বই, বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যের একটা অবিস্মরণীয় পথচিহ্ন হয়ে যা থাকবে।

সুতরাং "চলার পথের" পরিচয় দেবার জন্যে এ ভূমিকা নয়। এই ভূমিকা আমাকে এনে দিয়েছে একটা ব্যক্তিগত সুযোগ, আমার নিজের ব্যক্তিগত একটা আনন্দ প্রকাশ করবার সুযোগ। আজকের এই জনতাবহুল জীবনের যাত্রাপথে, যেখানে মানুষকে ঠেলে, মাড়িয়ে, ধাক্কা মেরে এগিয়ে চলতে হয়, সেখানে সকলের চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হলো, মানুষেরই দেখা পাওয়া দুর্লভ ঘটনা হয়ে আসছে। জনতা বাড়ছে, মানুষ কমে আসছে। আজকের এই বিরল-মানুষ জনতার ভীড়ে যেদিন 'চলার পথের' লেখকের দেখা পেলাম, সেদিন একটা বিস্ময়কর আনন্দের স্বাদ

পেয়েছিলাম, যে-আনন্দে রাত্রি-জাগা জ্যোতিবিদ বহুবর্ষ-জাগার পর আকাশের প্রান্তে দেখতে পায় নতুন তারকার সন্ধান··· সেদিন পেয়েছিলাম, একজন সত্যিকারের মানুষের সন্ধান, একটা অপূর্ব মধুর চরিত্রের সন্ধান। চলার পথের' প্রত্যেক লাইনের আড়ালে লুকিয়ে আছে, সেই অপূর্ব মানুষটী ···যে-মানুষ পথ চলতে পাশের লোককে ধাক্কা মারে না, যে-মানুষ নিজের দুঃখের কথা বলে অপরকে যন্ত্রণা দেয় না, যে-মানুষ নিজে অনাহারে থেকে অর্দ্ধাহারীর আর্ত্তনাদ নীরবে করে সহ্য;··· যে-মানুষ শিখেছে কি করে জীবনের কথা বলতে গিয়ে নিজেকে রাখতে হয় আড়ালে। চলার পথের লেখক হলেন, সেই মানুষ চলার পথের প্রত্যেক কাহিনীর আড়ালে রয়েছে সেই মধুময় মানুষের মনের সংগোপন মধু··· যে-চরিত্র লেখকের, সেই চরিত্র ফুটে উঠেছে লেখকের লেখায় ···সেইখানেই পরম সার্থক হয়ে উঠেছে এই আত্মচরিত-কাহিনীটি।

নিজের মনের সংগোপন বাতায়নটি খুলে, লেখক দেখেছেন চলার পথকে, দেখেছেন সেই পথের বিচিত্র পথিকদের···তাঁর দেখার গুণে পথ হয়ে উঠেছে জীবন্ত, পথের পথিকেরা হয়ে উঠেছেন প্রাণময়, মধুর। লেখক দীর্ঘ দিন, প্রায় এক যুগ ধরে, স্বাধীনতার সংগ্রামে কারাগারের বেদনা ভোগ করেছেন, সমস্ত যৌবন তাঁর কেটে গিয়েছে বেদনার মরুপথে, কিন্তু লেখক কোথাও এই পথ-চলার কাহিনীতে নিজের সেই একান্ত বেদনা আর ত্যাগকে vulgarise করেন নি · লেখকের নিজের কথা কাঁটার মতন পদে পদে পাঠককে পীড়া দেয় না। সত্যিকারের কবির মত, তাঁর বেদনার সরোবরে যে শতদল ফুটেছে, তাকেই তিনি তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে। বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যে এই মানসিক সংযম ও শালিনতার একটা বিশেষ মূল্য আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

চলার পথে

চলার পথে

এক

পথের মানুষ

চলার পথের দুই ধারে কত বিচিত্র বস্তু ও ব্যক্তিই না আস্তৃত রহিয়াছে, কত অজস্র ঘটনাই না প্রতি পলে পথের দুই পার্শ্বে অঙ্কুরের মত মাটির ঊর্ধ্বে মাথা জাগাইতেছে: কে তাহার হিসাব রাখে! অথচ সেই সব বস্তু, ব্যক্তি ও ঘটনার কয়টিইবা দুইটি চোখের লেন্সে তাহাদের ছায়া ফেলে; যে কয়েকটি ফেলে তাহাদের কয়টির ছাপই বা মনের প্লেটে মুদ্রিত হয় এবং যে কয়টি হয় তাহাদের কয়টির ছবিই বা চিত্তের পটে স্থায়িত্ব লাভ করে! তবু দুইটি মাত্র চোখের দর্পণ-পটে চিরচঞ্চল এই ঘটনা-প্রবাহের অহরহ যে অস্থির নর্ত্তন চলিয়াছে তাহার তাল সামলাতেই মন বেচারীর প্রাণান্ত, আপন মনের গোপন মণিকোঠার অন্ধকারে মুহূর্তমাত্র বিশ্রাম লাভ করিবার তাহার অবকাশ নাই। চেতনার আলোকে যাহারা আসিয়া চোখের সামনে ভীড় জমাইয়াছে, মন যখন তাহাদিগকে দুই হাতে দূরে ঠেলিয়া রাখিবার জন্য ব্যস্ত, অবচেতনের অন্ধকার ঠেলিয়া তখন কোথা হইতে বাহির হইয়া আসে অশরীরী প্রেত-মূর্তির মত অতীতের বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনাবলীর অফুরন্ত সারি। নিজের অবস্থার দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারি, গুরু গৌতম মুহূর্তের মোহ-প্রমাদের অপরাধে অভিশাপস্বরূপ স্বীয় শিষ্য দেবরাজ ইন্দ্রকে সহস্র

লোচন দান করিয়া কী গুরুদণ্ডই না বিধান করিয়াছিলেন! 'দুইটি মাত্র দৃষ্টির দুর্ভোগের মাত্রা যদি ইহাই হয়, তবে সহস্র লোচন লাভের বিড়ম্বনার পরিমাপ শুধু গণিতশাস্ত্রের সরল ত্রৈরাশিক অঙ্কের সাহায্যেই নির্ণেয়।

চলার পথের প্রায় শেষ পর্যায়ে আসিয়া পথের পাঁচালী গাহিবার বাসনা হইল; কিন্তু সুদীর্ঘ সে-পালাগান কোথা হইতে সুরু করিয়া কোথায় গিয়া শেষ করি ভাবিয়া পাইতেছিনা। স্মরণের অন্ধকার-সুড়ঙ্গ-পথে সহসা পা বাড়াইতে গা ছম্‌ছম্ করে। মনে পড়িয়া যায়—আগ্রা দুর্গের ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারা-প্রকোষ্ঠের কথা: আঁকা-বাঁকা গলি-পথ বাহিয়া পাতালপুরে নামিয়া চলিয়াছি, জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে সম্মুখে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে আমার গাইড, সদ্য-অপহৃত জীবনের দীপটি হাতে লইয়া যমদূত যেন মৃত ব্যক্তিকে লইয়া চলিয়াছে চিত্রগুপ্তের সেরেস্তায় আসামী জমা দিবার জন্য; কাহারও মুখে কোন কথা নাই, নির্ব্বাত-নিষ্কম্প দীপশিখাটি শুধু ধ্রুব-জ্যোতিতে জ্বলমান। লোক এবং আলোক দর্শনে চকিত হইয়া নিশাচর চামচিকাদল সহসা উচ্চ চীৎকারে পাতালপুরী আলোড়িত করিয়া তুলিল; মনে হইল, বহু শতাব্দী ধরিয়া যেসব দণ্ডিত হতভাগ্য পাতালপুরীর এই অন্ধকার কারাগারে তিল তিল করিয়া মৃত্যু-বরণ করিয়াছে তাহাদেরই প্রেতাত্মা যেন সমবেত কণ্ঠে প্রতিবাদ তুলিয়াছে সেই অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে—বিচারের নামে যাহা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, বিধাতার দেওয়া আলো ও বাতাসের মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ আশীর্ব্বাদ হইতে। ভয় হয়, অবচেতনের অন্তস্তলে যে সব অতৃপ্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা, অসন্তুষ্ট বঞ্চনা ও বেদনা গভীর ঘুমে সুপ্ত রহিয়াছে, স্মরণের আলোক-সম্পাতে যদি সহসা তাহারা চকিত হইয়া এক সঙ্গে কথা কহিয়া

উঠিতে চায়, তাহা হইলে কাহার মুখে হাত দিয়া কাহাকে কথা কহিতে বলিব, কাহাকে থামাইয়া কাহার কথা শুনিব ! দুর্গের উপরতলায় যখন নাচে ও গানে, বর্ণে ও গন্ধে, আলোকে ও পুলকে আনন্দের বান ডাকিয়াছে, নীচেরতলার অধিবাসিগণ তখন সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথ দিয়া প্রবিষ্ট অতি ক্ষীণ আলোকরশ্মির আসা-যাওয়া দেখিয়া চন্দ্র সূর্যের উদয়-অস্ত নির্ণয় করিয়াছে, তাহারই মধ্যে ক্বচিৎ হয়তো ভাসিয়া আসিয়াছে ঊর্ধ্বলোকের আনন্দ কলরবের এতটুকু ক্ষীণ রেশ, সঙ্গীতের একটুখানি সুর, নৃত্য-চপল-চরণের নূপুর শিঞ্জিতের অস্ফুট রিণিঝিণি। সে-শব্দ অন্ধকারার বন্দিদের বুকে সেদিন যে-তরঙ্গ তুলিয়াছিল, নিশাচর পাখার কণ্ঠে জাগিয়া উঠিয়াছে বুঝি তাহারই করুণ কল্লোল। জীবনের উপরতলার বিলাস-ভবনে যেসব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহারা নিঃসন্দেহে পাঁচজনকে ডাকিয়া দেখাইবার যোগ্য ; কিন্তু স্মরণের সোনার কাঠির সঞ্জীবন-স্পর্শে তাহাদিগকে জাগাইতে গিয়া নীচেরতলার নিপীড়িত সত্তাসমূহ যদি তাহারই ছোঁয়ায় জাগিয়া উঠে, কোন্ শাসনদণ্ড-প্রহারে তাহাদিগকে সংযত করিব, কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপের দল যদি কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া আসে, তাহাদিগকে শান্ত করিব কোন্ মোহনমন্ত্রে ? এই কারণে জীবন-আখ্যায়িকামাত্রই আংশিক এবং সে অংশ শুধু সেই সব ঘটনারই চিত্র বহন করে, গৌরব-প্রভায় যাহা প্রদীপ্ত, বর্ণবিভায় যাহা সমুজ্জ্বল। সকল ঘটনার ঘটক রূপে আপনাকে ফোটাইয়া তুলিবার জন্য কিছু রাখিয়া কিছু বলা, কিছু ঢাকিয়া কিছু খোলা, আত্মকথা কহিবার যে সনাতন প্রথা প্রচলিত আছে সে পথ আমার নয়। আমি পথের মানুষ, জীবনের চলার পথে জনতার ভীড়ে ও নির্জন একান্তে যাহা কিছু আমার উদাস দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে, চোখের ভিতর দিয়া বিবাগী মনকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার উপর যে ছোঁয়ার স্থায়ী ছাপ রাখিয়া গিয়াছে,

আমি শুধু তাহারই কাহিনী কহিয়া চলিব, সেই পথেরই পাঁচালী গান গাহিয়া চলিব :

আমার নয়নে নয়ন রাখিয়া
দেখেছ কি কভু চাহি,
দেখেছ কি তার অতল অপার
বিস্ময়ে অবগাহি ?
যে কথা শিল্পী আমার চোখের
মণিতে বেঁধেছে বাসা,
পড়েছ কি তার গোপন গ্রন্থ,
বুঝেছ কি তার ভাষা ?
তাহার হাতের লেখনী আমার
যুগল আঁখির পাতা
আঁখি-পটে মোর লিখিয়া চলেছে
কত বিচিত্র গাথা ;
কত বেদনার করুণ কাহিনী,
কত আনন্দ গীতি,
কত দুখ-ভরা বঞ্চনা আর
কত বুক-ভরা প্রীতি !

দুই

আমারে দিয়েছ শুধু পথ !

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব মহলে এবং নিজের মনের মজলিসেও আমি পথের মানুষ নামে পরিচিত।

গোড়াতেই নাম সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ দিয়া রাখা প্রয়োজন: আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে, 'পথের মানুষ' আমার পিতৃদত্ত নাম নয়। কোন কোন পিতা নিজের কৃতকর্মের ফলে পুত্রকে পথে বসাইয়া যান এরূপ দৃষ্টান্ত যদিও সমাজে বিরল নয়, তথাপি কোন পিতাই সাধ করিয়া নিজের ছেলের এমনধারা একটা ছন্নছাড়া নামকরণ করিতে রাজী হইবেন বলিয়া মনে হয় না। এ নাম আমার স্বোপার্জিত; যে মূল্যে আমাকে ইহা অর্জন করিতে হইয়াছে তাহা সর্বস্বান্তকর, যে অবস্থায় আমাকে এ সম্বোধন সানন্দে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে তাহা নাটকীয়। বিশুদ্ধ প্রাক্তন রাজভাষার প্রবাদ মতে, আমি চাঁদির চামোচ মুখে লইয়াই মাটিতে আসিয়াছিলাম; কিন্তু ধরায় আসিবার সময় যে নিষ্ঠুর-পরিহাস-প্রিয় নিয়তি বহু সুখ ও সম্পদের বোঝা আমার জীবন-রথে চাপাইয়া দিয়াছিলেন তিনিই আবার সে-রথের সারথিরূপে জুড়িয়া দিলেন এমন এক খাপছাড়া খেয়ালী মনকে যে পথের নেশায় কোনদিন পাথেয়র হিসাব রাখিল না, চলার মোহে জীবনের সব সঞ্চয় হেলায় হারাইয়া বসিল। লাভের অঙ্কটা বারান্তরের জন্য বাঁয়ের ঘরে জমা রাখিয়া আপাতত ক্ষয়ের খতিয়ানটাই দক্ষিণ হস্তে পেশ করি:

জেলার সহর হইতে আমাদের গ্রামের বাড়ী প্রায় আট ক্রোশ। পূর্বদিন রাত্রিকালে এই কথা স্থির করিয়াই শয্যা গ্রহণ করিলাম যে,

পরদিন অতি প্রত্যূষে বাড়ী হইতে রওনা হইয়া আমাকে বহরমপুর ষ্টেশনে বেলা দশটার ট্রেণ ধরিতে হইবে এবং যথাসময়ে জিয়াগঞ্জ পৌছাইয়া সেই দিন রাত্রির গাড়ীতেই মেদিনীপুর রওয়ানা হইতে হইবে। শয্যার আশ্রয় যখন গ্রহণ করিলাম, আকাশ তখনও নির্মেঘ, বাতাসে তখনও আসন্ন ঝটিকার আভাষ পর্যন্ত নাই। শেষ রাত্রির দিকে ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া দেখি, প্রকৃতির বুকে খণ্ড প্রলয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে : ঝঞ্ঝাতাড়িত মেঘের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে দিগ্বিদিকে, আকাশে-বাতাসে সাইক্লোনিক আবহাওয়ার সুস্পষ্ট আভাস; বাড়ীর লোকজন সে-অবস্থায় বাড়ীর বাহির হইতে দিতে নারাজ। কিন্তু উপায় নাই; যে গুরু দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত, যে কোন উপায়ে হোক আমাকে তাহা উদ্‌যাপন করিতেই হইবে। তাহা ছাড়া, দারুণ দুর্যোগ তাহার বৈদ্যুতিক অঙ্গুলির ইসারায় আমাকে পথে বাহির হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে; আজন্ম বুকে আমার বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে যে বিবাগী-বাউল, ঘর-ছাড়া এ-ডাকে সে সাড়া না দিয়া পারে কি? গামছায় জড়ানো একটি কাপড়ের পুঁটলি কোমরে বাঁধিয়া এবং ছেঁড়া ছাতাখানা বগলে দাবিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। গ্রাম তখনও নিশুত, পথ নির্জন; কচিৎ কোন গৃহ হইতে ভাসিয়া আসিতেছে বৃদ্ধের কাশি ও শিশুর কান্নার শব্দ; বাহিরে দুর্যোগের সাড়া পাইয়া ঘরের দরজা জানালা হয়তো আরও ভাল করিয়া আঁটিয়া দিয়াছে, গায়ের ঢাকাটা আরও নিবিড় করিয়া সর্বাঙ্গে জড়াইয়া দিয়াছে। ভোর প্রায় হইয়া আসিল ভাবিয়া পথে নামিয়া পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু সময় সম্বন্ধে মনে মনে একটা সংশয় রহিয়া গিয়াছিল, নিশির ডাকে মাঝ-রাতে পথে বাহির হইয়া পড়ি নাই তো! বুড়ার কাশি ও ছেলের কান্নার আওয়াজে সে সংশয় ছুটিয়া গেল; বুঝিলাম, সূর্যের ভেরী-নিনাদে ভোরের আগমন-বার্তা

হয়তো আজ আর ঘোষিত হইবে না, তবু ভোর আসিবে এবং আসিবে অনতিবিলম্বে। আপনারা হয়তো অবাক্ হইয়া ভাবিতেছেন ভোরের হাসির সহিত ছেলে-বুড়োর কান্না-কাশির সম্বন্ধটা কি! অবাক হইবারই কথা: রাতের পৃথিবীর পথের রহস্যের সঙ্গে যাহার পরিচয় নাই, সে-রহস্যের অস্ফুট গুঞ্জন শুনিবার কান যাহার নাই, তাহার মর্ম উপলব্ধি করিবার প্রাণ যাহার নাই—আমার কথা তাহাদের কাছে প্রহেলিকার মত ঠেকিবে বই কি! কিন্তু বিশ্বাস করুন, পথের সে-রহস্য আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় নয়: শৃগালের কণ্ঠে যেমন রজনীর যাম ঘোষিত হয়, আমি দেখিয়াছি প্রহর-ভেদে মানুষের কণ্ঠস্বরেও তেমনি আবেশ-বিহ্বলতার মাত্রার আধিক্য ও অল্পতা ঘটে, খেয়াঘাটের নায়ের মাঝির ডাক শুনিয়া, তামাকু-সেবনরত বৃদ্ধের কাশির শব্দ শুনিয়া, সদ্য জাগ্রত শিশুর ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া ও তাহাকে সান্ত্বনাদানরতা জননীর স্নেহঘন সোহাগ বচন শুনিয়া আমি নির্ভুলভাবে বলিয়া দিতে পারি রজনীর ইহা কোন্ যাম।

একা নিঃশব্দে পথ চলিয়াছি: বাহিরে আমি একা, কিন্তু অতীতের বহু স্মৃতি অন্তরে আসিয়া ভীড় করিয়া বসিয়াছে; চিৎ-সমুদ্রের চঞ্চল বুকে চিন্তার বুদ্‌বুদ্‌গুলি প্রতি মুহূর্তে উঠিতেছে ও ডুবিতেছে, ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে; মাথার উপর তখনও চলিয়াছে মত্ত মেঘদলের কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ক্ষিপ্ত মাতামাতি। ঝড়ের বেগ তখনও তেমনি উদ্দাম, বৃষ্টির ধারা আসিয়া সর্বাঙ্গে বিঁধিতেছে শাণিত শায়কের মত, চর্মের বর্মে আহত হইয়া তাহারা সর্বাঙ্গ বহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে অজস্র ধারায়। বারুইপাড়া গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্ত: হঠাৎ এলোমেলো হাওয়ায় কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর; মনে হইল কে যেন কাহাকে ডাকিতেছে। আবার আওয়াজ আসিল:

ওগো-ও-ও-গো! এবার ডাক আরও স্পষ্ট, কিন্তু তাহা যে আমাকে সম্বোধন করিয়া—এমন কথা মনে করিবার কোন হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না। পিছল পথে পা টিপিয়া যথাসম্ভব সন্তর্পণে অথচ সত্বর আগাইয়া চলিয়াছি। আরও নিকট হইতে আবার আহ্বান আসিল: ওগো–ও পথের মানুষ! একী অদ্ভুত ডাক, একী অপূর্ব সম্বোধন! সে-ডাকে বিবাগী-বাউল-মনটা বুকের মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল, উধাও হইতে চাহিল ঝড়ের মুখে পাখা মেলিয়া। দেখিলাম, পথে কোথাও জন-মনুষ্যের চিহ্নমাত্র নাই; সুতরাং বুঝিলাম, সে-সম্বোধন শুধু আমাকেই লক্ষ্য করিয়া, অন্য কাহাকেও নয়। হঠাৎ বাঁদিকে চাহিতে চোখে পড়িল পক্ক গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত একখানি সদয় মুখ: এক বৃদ্ধ মুসলমান মসজিদের উঁচু দাওয়ায় দাঁড়াইয়া হাতের ইসারায় আমাকে নিকটে ডাকিতেছেন। হাতে আমার সময় যদিও অল্প; প্রায় মধ্যপথে আসিয়া পড়িয়াছি, ষ্টেশনে পৌঁছিতে এখনও অর্ধপথ আমাকে অতিক্রম করিতে হইবে; তবু সে-ডাকে সাড়া না দিবার সামর্থ আমার হইল না। মসজিদের উঠানে গিয়া দাঁড়াইলে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে অনুযোগ আসিল: বাবা, এই দুর্যোগে কেহ কি পথে বাহির হয়! হাত-পা ধুইয়া, গা-মাথার জল মুছিয়া খানিকক্ষণ জিরাইয়া লও, জল-ঝড় পড়িয়া আসিলে আবার রওয়ানা হইও! সকৃতজ্ঞকণ্ঠে আমি বলিলাম: ঘরের মানুষ এমন দুর্দিনে পথে বাহির হয়না সত্য, কিন্তু 'পথের মানুষের' পথ চলিবার ইহাই তো মাহেন্দ্রক্ষণ। মাফ্ করিবেন, থামিবার আমার সময় নাই, পথ চলিতেই হইবে, কিন্তু আপনার এই ডাক আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। সেলাম!

আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। অদূরে কুমীরদহের বিল, তারের শিশুগাছের ঘন শ্রেণী এখান হইতে চোখে পড়িবার কথা, কিন্তু অন্ধকারে

আজ সব অবলুপ্ত। খেয়ালী-মনকে আশৈশব আমি চিনি, জানি তাহার স্বরূপ ও স্বভাব; শুধু জানিতাম না—কোন্ প্রিয় নামে তাহাকে ডাকিব, কোন্ যোগ্য সম্বোধনে তাহাকে আহ্বান করিব! আজ দুর্লভ সে-সম্বোধনের সাক্ষাৎ পাইলাম নিদারুণ এই দুর্যোগক্ষণে। সে-আহ্বান বাহিরের প্রাকৃতিক প্রলয়ের সহিত তাল রাখিয়া অন্তরে আমার ভাবাবেগের তুফান তুলিয়াছে! আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে আবৃত্তি করিতে করিতে পথ-চলা পুনরায় সুরু করিলাম:

"হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর আমারে দিয়েছ শুধু পথ"!

তিন

কাঁড়াদাস বাবাজী

এক দুর্যোগের কথা বলিতে গিয়া বহু দূর অতীতের আর এক দুর্যোগ-দিনের প্রায়-ভুলিয়া-যাওয়া কাহিনী হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল: যতদূর স্মরণ হয়, সেদিন ছিল বাংলা সন ১৩২৬ সালের শারদীয়া পূজার মহাষ্টমী। সেবারের ঝড়ের ঝাপটায় ও বৃষ্টির বেগে সমগ্র বাংলার পূজামণ্ডপে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটিয়া যায়, এমন কি, নিরঞ্জনের ব্যবস্থা পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়ার ফলে উমার পতিগৃহে যাত্রা কয়েক দিনের জন্য স্থগিত রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। আমাদের স্বগ্রাম তখনও আজিকার মত শ্মশানে পরিণত হয় নাই, তখনও পল্লীর বুকে প্রাণ ছিল, প্রাণময়ী পল্লী-জননীর হৃদয়ে আপন সন্তানগণের জন্য স্নেহের আকর্ষণ ছিল; সেদিন দুর্নিবার সেই আকর্ষণই আমাকে দূর হইতে

টানিয়াছিল গৃহের পানে, তাই দুর্যোগ ঘনঘটার ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া দুর্গম-পথে আমার যাত্রা। জগন্নাথের রথ কিন্তু এবার চলিয়াছে উল্‌টো-মুখো, সহর হইতে চলিয়াছি গ্রামের দিকে। বহরমপুর হইতে কুমীরদহের বিল পর্যন্ত প্রথম সাত মাইল পথ পাকা, কাজেই তাহা পার হইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। খেয়ার নায়ে উঠিবামাত্র মাঝি শুনাইয়া দিল, নৌকায় ওঠার পালা এবার কিন্তু এইখানেই সাঙ্গ নয়, পথে সম্ভবতঃ আরও দুই একবার নৌকা-বিহার করিতে হইবে। হেতু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঝড়ের আঘাতে আহত খাল-বিল ও নদীর ক্রুদ্ধ জলরাশি কোথাও পথ ছাপাইয়া, কোথাও বা রাস্তা ভাঙ্গিয়া উদ্দাম ছুটিয়া চলিয়াছে।

দুর্যোগজনিত ধ্বংসকাণ্ড যে এতখানি ব্যাপক, সহরের দালান-কোঠার দরাজ আশ্রয়ে অবস্থিত রহিয়া তাহা অনুমান করিতে পারি নাই; চলার পথের দুই ধারের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইল: মনে হইল, পশ্চাদপসরণরত সেনাদল যেন শত্রু-সৈন্যের অগ্রগতি ব্যাহত করিবার জন্য পথের বহুস্থানে ব্যবধান রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মাথার উপরে প্রবল বর্ষণে ঝরিয়া পড়িতেছে দুর্যোগের অজস্র অভিশাপ-ধারা, ঝড় পিছন হইতে সম্মুখে ঠেলিতেছে প্রচণ্ড বেগে, কিন্তু পিছল পথে সে বেগের সহিত তাল রাখিয়া পা ফেলা বিপজ্জনক; পথের পিচ্ছিলতা পদস্খলনের সহায়ক হইতে পারে, কিন্তু দ্রুত অগ্রগমনের পক্ষে আদৌ অনুকূল হইল না। মধ্যাহ্নের আহারাদি শেষ করিয়া বহরমপুর হইতে বাহির হইয়াছিলাম; কুমীরদহের বিল পার হইয়া দুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে বেলা প্রায় পড়িয়া আসিল, আরও দুই মাইল না আগাইলে হরিহরপাড়ায় পৌঁছানো যাইবে না এবং হরিহরপাড়ায় না পৌঁছাইলে রাত্রির মত মাথা লুকাইবার

একটা আশ্রয়ের সন্ধান মিলিবে না। ছাতাখানা অপ্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে বগলে আশ্রয় লইয়াছে, কাপড়ের পুঁটলি কটীবদ্ধ হইয়া কোমরে জড়াইয়াছে : 'পথের দাবী'র মূর্তিমান গিরিশ মহাপাত্র যেন আজ দুর্যোগ দিনের দুর্গম পথের যাত্রী! হরিহরপাড়ার বাজারে আসিয়া যখন হাজির হইলাম, রাত্রি তখন প্রায় এক প্রহর। গুটি পাঁচ ছয় মাত্র দোকানের সমষ্টি লইয়া তথাকথিত এই বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে। মনে পড়িয়া গেল এই গ্রামস্থ এক আত্মীয়ের কথা : যে-কয়টি বস্তুর জন্য স্বগ্রাম সম্বন্ধে তিনি বিশেষ গর্ব পোষণ করিতেন তথাকথিত এই বাজারটি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদিগকে ধিক্কার দিবার জন্য তিনি প্রায়ই বলিতেন; তোদের গাঁয়ে কি আছে রে পাড়াগেঁয়ে ভূত, থানা আছে, ডাক বাংলা আছে, বাজার আছে, পানের বর (বরজ) আছে? বলিতে বাধা নাই, নিজের গ্রামের দৈন্যের কথা স্মরণ করিয়া সে-ধিক্কারে মনে মনে লজ্জা বোধ করিতাম এবং হরিহরপাড়া সম্বন্ধে ঈর্ষামিশ্রিত এক শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতাম।

দোকানদারগণ তখন দ্রুত হস্তে দোকান গুটাইতে ব্যস্ত। সে কাজ শেষ হইলেই দোকান বন্ধ করিয়া তাহারা আপন আপন বাড়ী চলিয়া যাইবে; বুঝিলাম, হট্টমন্দিরে আশ্রয় লাভের কোন আশাই নাই এবং খোলা বারান্দায় আশ্রয় লইলে দুর্যোগ-রাতের আবহাওয়ার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইবে। তাহা অপেক্ষা তরুতলই প্রশস্ততর আশ্রয়। জনৈক দোকানী আমার দুরবস্থা দেখিয়া ও ভাবগতি বুঝিয়া অদূরবর্তী একটি আলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, ওই যে দেখিতেছেন মিটমিট করিয়া একটা আলো জ্বলিতেছে—ওটা এক বৈরাগীর আখড়া, আপনি ওখানে যান, রাতের আস্তানা ওখানেই মিলিবে; এখান হইতে প্রতাপপুর পর্যন্ত পথ অত্যন্ত দুর্গম, এই রাত্রে কদাচ পথে বাহির হইবেন না।

রওয়ানা হইলাম অস্পষ্ট আলোকরাশ্মি অনুসরণ করিয়া; কিছুদূর যাইতে না যাইতে হঠাৎ হুমড়ি খাইয়া কি যেন একটা বস্তুর উপর পড়িলাম, হাতড়াইয়া বুঝিলাম উহা বেড়া। সুরু করিলাম, গৃহস্বামীর উদ্দেশে আহ্বান। সাড়া আসিতে বিলম্ব হইল না; দেখিলাম আলোক-বর্তিকা আমার দিকে আগাইতে আরম্ভ করিয়াছে। স্থূলকায় কৃষ্ণমূর্তি এক বৈষ্ণব বেড়ার গোড়ায় আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কে বাবা, তুমি?

বলিলাম, আমি অতিথি।

যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া নারায়ণ-নারায়ণ বলিতে বলিতে তিনি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

ছোট এক-টুকরা বাগান পার হইয়া উভয়ে গিয়া একটি চালা-ঘরের দাওয়ায় উঠিলাম। আমার দুরবস্থা দেখিয়া বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী যে মর্মান্তিক বেদনা পাইয়াছেন, তাঁহাদের চোখে-মুখে তাহার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

বসিবার পর বৈষ্ণব প্রশ্ন করিলেন, বাবা আপনার আশ্রম?

সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, আমি ব্রাহ্মণ সন্তান।

নারায়ণ-নারায়ণ! কী সৌভাগ্য আমার, স্বয়ং প্রেমের ঠাকুর আজ আমার আশ্রমে অতিথি! বস্ত্র পরিবর্তন করিতে করিতে বৈষ্ণবী এক বাল্‌তী জল ও একটি ঘটি লইয়া ঘরের সিঁড়িতে আসিয়া বসিলেন, সস্নেহে বলিলেন, বাবা, একটু এখানে আসিয়া চরণ দুটি বাড়াইয়া দিন, আমি ধোয়াইয়া মোছাইয়া দি; কাদায় এমনভাবে ঢাকিয়া গিয়াছে যে, শ্রীচরণের দর্শন মেলাই দায়!

কথাটা খুবই সত্য: মনে মনে বলিলাম, অন্তত আড়াই পোঁচ মাটি চাঁছিয়া না ফেলিলে শ্রীচরণের সাক্ষাৎ-পরশন মিলিবে কিনা সন্দেহ।

আপত্তি যথেষ্টই জানাইলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না, বৈষ্ণবীর জিদ শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হইল: কাদা-লেপা পা দুখানা সযত্নে ধোয়াইয়া মুছাইয়া বৈষ্ণবী আমার জন্ম শয্যা রচনা করিয়া দিলেন।

বিছানায় বসিলে আহারের প্রস্তাব আসিল: প্রস্তাব অবশ্য লোভনীয়, কিন্তু কার্যে পরিণত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য; বৈষ্ণব বলিলেন, বাবা, আমরা ময়দা মাখিয়া উনোন ধরাইয়া দিতেছি। খানকয়েক লুচি ভাজিয়া লউন, ঠাকুরের ভোগে লাগিবে—আমরাও প্রসাদ পাইব। ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর প্রস্তাব আর কি হইতে পারে! কিন্তু বিপদ হইল এই যে, লুচি ভাজিবার বিদ্যা আমার জানা নাই; নিজের অকর্মণ্যতার জন্ম নিজের উপর ধিক্কার জন্মাইল: হায়, অপদার্থ অসনবিলাসী ব্রাহ্মণ! সারা জীবন শুধু ভোজনই করিয়াছ, ভাজন শেখ নাই! তাই এ-হেন দুর্যোগ রাত্রিতে গৃহে-প্রস্তুত খাঁটি গব্য ঘৃতে ভাজা তপ্ত লুচি পাতে আসিয়াও পথে ফিরিয়া যাইতেছে! নিজের অক্ষমতার কথা গোপন করিয়া বলিলাম, সারাদিনের পথ-চলার পরিশ্রমে, জল ও ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া শরীর একেবারে অবসন্ন, আহারের ইচ্ছা মাত্র নাই, এখন একটু শুইতে পারিলে বাঁচি। সেকথায় লুচি ভাজার ব্যবস্থা বাতিল হইল বটে, কিন্তু আর এক দিক দিয়া ফল হইল বিপরীত: বেদনা-বিহ্বল-কণ্ঠে বৈষ্ণব বলিলেন, গৃহে অতিথিকে অভুক্ত রাখিয়া আমরা তো আহার করিতে পারি না, কাজেই রাত্রির মত আমাদিগকেও অনাহারে থাকিতে হইবে। অগত্যা দুধ গুড় ও মর্তমান কলা সহযোগে চিঁড়া ভোজনের বিকল্প প্রস্তাব আসিল এবং তাহা গৃহীতও হইল অত্যন্ত তৎপরতার সহিত। সে-পর্ব সমাধা হইলে তাঁহারা উভয়ে আহারে বসিলেন ও আহারান্তে বৈষ্ণব আসিয়া বসিলেন আমার শিয়রে, বৈষ্ণবী আসন গ্রহণ করিলেন আমার পদতলে; অত্যন্ত লঘু হস্তে

পায়ের ঢাকা খুলিতে খুলিতে বৈষ্ণবী বলিলেন, বাবা, চরণ দুইটি একবার বাড়াইয়া দিন, একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দি ; সারাটা দিন কাদা-পাঁক ভাঙিয়া পা দুখানার কি দুরবস্থাই না হইয়াছে! লজ্জা কি বাবা! আপন দিদি হইলে ভায়ের এই অবস্থা চোখে দেখিয়া কি চুপ করিয়া থাকিতে পারিত, না তুমিই তাহাকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহিতে! আপ্যায়ন ও আতিথেয়তায় অভিভূত হইয়া, আন্তরিকতার আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হইয়া খেয়ালী খেপা মনটা আমার বুকের মধ্যে পড়িয়া এতক্ষণ ধুঁকিতেছিল ; স্নেহের তূণ হইতে নিক্ষিপ্ত এই শেষ অস্ত্রের আঘাত সে সহ্য করিতে পারিল না : গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল, বিহ্বল হইয়া ভাবিতে লাগিল, সাষ্টাঙ্গে পায়ে লুটাইয়া পড়ি, না এই মুহূর্তে পথে ছুটিয়া বাহির হই!

সারাদিনের পথ চলায় পরিশ্রান্ত ও বেদনা-পীড়িত পা দুখানা স্নেহের দাবীর নিকট নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিলাম, তিল তিল করিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলাম মাতৃস্নেহের সেই অমৃত আস্বাদ—সংসারের মরুপথে আমি যাহার জন্য আজীবন যাযাবর।

আহারান্তে বৈষ্ণব আসিয়া হুঁকা হস্তে শিয়রে বসিয়াছেন এবং কথা কহিতে কহিতে মাঝে মাঝে গভীর মনোযোগের সহিত আমার মুখের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন। অবশেষে প্রশ্ন করিলেন, বাবা, আপনার নিবাস?

গ্রামের নাম শুনিয়া কতকটা স্বগতকণ্ঠেই তিনি বলিলেন : হুঁ, আমিও তাহাই আন্দাজ করিয়াছিলাম। মুখ আমার কানের আরও নিকটে আনিয়া যেন কতকটা গোপনীয়তার চাপা-গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা, কালীবাবু, লোকনাথবাবুকে আপনি চেনেন তো? পরিচয়ের কথা স্বীকার করিলে বৈষ্ণব তাঁহার পূর্বকৃত অনুমান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়া বলিলেন,

বাবা, সে রাত্রে আপনি না থাকিলে আমাকে জীয়ন্ত পুড়িয়া মরিতে হইত, সেদিন আপনার দয়াতেই আমি প্রাণ পাইয়াছি!

জীবন্ত দগ্ধ হওয়া—আমার দয়াতে প্রাণ পাওয়া—এসব কী কথা বলিতেছে বৈষ্ণব! সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মত ঠেকিতে লাগিল। আমার চোখে মুখে বিস্ময়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তিনি আরও নিকটে আগাইয়া আসিয়া অধিকতর চাপা গলায় প্রশ্ন করিলেন, বাবা, আপনাদের গাঁয়ে সেই ঘোষাণীর বাড়ীতে আগুন লাগার কথা মনে আছে?

মুহূর্তে সব ঘটনা মনের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত ঝিলিক মারিয়া গেল, অস্ফুটস্বরে মুখ দিয়া আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিল, কী সর্বনাশ! কাঁড়াদাস বাবাজি নাকি! ভয় হইল—সে দিনের ঝকমারীর মাশুল আজ হয়ত আমাকেই কড়া-ক্রান্তিতে গণিয়া দিতে হইবে!

ঘটনাটা খুলিয়া বলি: তখন হইতে প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাবাজী আমাদের গাঁয়ের এক ঘোষাণীর বাড়ীতে যাওয়া-আসা করিতেন, মেয়ে-মহলে কীর্তন গাহিতেন ও কৃষ্ণকথা আলাপ করিতেন। তাঁহার সত্যিকার নাম কি ছিল তাহা আমরা জানিনা, তবে কালো মোটা-সোটা চেহারা দেখিয়া গ্রামের লোক তাহার নাম রাখিয়াছিল কাঁড়াদাস বাবাজী। একদিন রাত্রিকালে ঘোষাণীর ঘরে আসর যখন জম-জমাট এমন সময় ঘরে আগুন লাগিয়া গেল; লোকের ধারণা হইল, বাবাজীর গাঁজার কলিকাই এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী, কাজেই তাহারই লাগানো আগুনে তাহাকে পোড়াইয়া মারিবার প্রস্তাব কেহ কেহ বস্তুত উত্থাপন করেন এবং প্রস্তাবকগণের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে আমার যতটুকু ধারণা ছিল তাহা হইতে মনে হইল, প্রস্তাব কার্যে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। বাবাজীর স্কন্ধে তখন জল বাহিবার জন্য কলসী চাপাইয়া দেওয়া

হইয়াছে এই ভীতি প্রদর্শন করিয়া যে, আগুন আয়ত্তে আসিলে তাহার সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে! আর সকলে আগুন লইয়া যখন ব্যস্ত, আমি নদীর ধারে নামিয়া বাবাজীকে বলিলাম, বাবাজী, প্রাণে বাঁচিবার যদি সাধ থাকে, এই মুহূর্তে কাঁধের কলসী মাটিতে নামাইয়া সোজা এই গলি-পথ দিয়া চম্পট মারুন যেদিকে দুই চোখ চলে। বাবাজী আমাকে যেন ঠিক বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, নঃ যযৌ নঃ তস্থৌ অবস্থায় অচল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আবার বলিলাম, ভাবিবার অবসর নাই, পালাইতে যদি চান তবে এখনই—এই মুহূর্তে। বাবাজী অতঃপর কালবিলম্ব না করিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে যখন বাবাজীর খোঁজ পড়িল, বাবাজী তখন গ্রামের প্রান্তে এক গৃহস্থের ধানের গোলার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

বাবাজী পুনরায় আমার উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া বলিলেন, ভগবানের অসীম করুণা যে, আমার জীবন-দাতার সেবা করিবার দুর্লভ সুযোগ তিনি আমাকে দান করিয়াছেন। একে অতিথি, তায় ব্রাহ্মণ, তার উপর ভয়ত্রাতা ও প্রাণদাতা—এযে আমার সৌভাগ্যের ত্রিবেণী-সঙ্গম!

—কিন্তু বাবা, আপনি তো জানেন, আগুন লাগাইবার অপরাধে আমি অপরাধী নই, সে কাজ আর একজনের!

আমি মুখে কোন কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম: অগ্নিকাণ্ডের অনেকদিন পরে অনুসন্ধান শেষে জানা যায় যে, ঘোষাণীর ঘরে আর এক বাবাজী ইতিপূর্বে যাতায়াত করিত; কাঁড়াদাসের সে-আসরে আবির্ভাব দেখিয়া তাহার আশঙ্কা হইল ভক্তমণ্ডলে তাহার পসার আর বুঝি থাকে না। তাই দুর্ঘটনার রাত্রে আসর যখন

ঘরের ভিতর ঘন হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, প্রথম বাবাজী প্রতিশোধ লইবার জন্য গোপনে সেখানে আসিয়া ঘরে আগুন দিয়া চম্পট দেন, বেচারা কাঁড়াদাস বাবাজী জানিতেও পারিল না, কী নিদারুণ ফাঁড়ার এক শাণিত খাঁড়া তাহার গর্দানের উপর সে ঝুলাইয়া রাখিয়া গেল !

বাবাজী এবং মাতাজী গভীর রাত্রে শয্যা গ্রহণ করিলেন, আমি কিন্তু সারারাত্রি জাগিয়া বসিয়া বিনিদ্র রজনীর প্রহর গুণিতে লাগিলাম। বাইরের দুর্যোগে যদিও তখন পর্যন্ত ভাটার চিহ্নমাত্র নাই, অন্তরের দুর্যোগ-অন্ধকার কিন্তু আনন্দের আলোক সম্পাতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, হাসি-অশ্রুর সংমিশ্রণে মনের আকাশে রাঙিয়া উঠিয়াছে অপরূপ ইন্দ্রধনুর বিচিত্র-বর্ণ-সমারোহ !

চার

শুক পাখীর উপাখ্যান

পরের দিন সকালে উঠিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম : আশ্রয়দাতা-গণের আন্তরিক অনুনয় সত্ত্বেও একবেলার জন্যও অবস্থান করা সম্ভব হইল না। দুর্যোগ তখন অবশ্য কিছুটা পড়িয়া আসিয়াছে, কিন্তু ভয় হইল বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেগ যদি আবার বাড়িয়া উঠে ! এক গেলাস গরম দুধ গলাধঃকরণ করিয়া আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বাবাজী পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বাবা কথা দিয়া যান—আবার যখন -এ পথে আসিবেন আশ্রমে পায়ের ধূলা দিয়া যাইবেন !

আমি সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলাম, নিশ্চয় আসিব ; এবার দুর্যোগ রাতে ঘরে-দরজায় কেবল কাদাই লেপিয়া গেলাম, ধূলা দেওয়া আর ঘটিয়া উঠিল না, এবারে এমন দিনে আসিব যেদিন শুকনা পথের প্রচুর ধূলা পায়ে মাখিয়া লইয়া আসিতে পারি, তাহাতে লাভ হইবে এই যে, কাদা-পাঁক পরিষ্কার করিতে দিদির আমার যত কষ্ট হইয়াছে তাহা হইতে অনেক সহজে ও স্বচ্ছন্দে পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিতে পারিবেন।

উভয়েই হাসিলেন, চোখে ও মুখে হাসি দুর্যোগক্লান্ত আকাশে ব্যথা ও আনন্দের অপূর্ব রামধনু-মায়া রচনা করিল।

আশ্রম পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইলাম ; মনে হইতে লাগিল, একান্ত প্রিয়জনের আন্তরিক অনুনয় যেন প্রতি পদে পশ্চাৎ হইতে আমাকে পিছনে টানিতেছে। এ আকর্ষণ দান-প্রতিদান বা উপকার-প্রত্যুপকারের প্রশ্ন নয়, উদাসীন মনটা আমার বৈরাগীর গৈরিক উত্তরীয়ের প্রতি আশৈশব যে নিবিড় আত্মীয়তা-বোধ ও গভীর আকর্ষণ পোষণ করে, ইহা তাহারই বহিঃপ্রকাশ। এই আকর্ষণের হেতু নির্ণয় করিতে গিয়া জীবনের প্রতিটি পর্যায় আমি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি, প্রতিটি চিন্তা ও ভাবনার তাৎপর্য কঠোর সমালোচনার দৃষ্টি দিয়া বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছি এবং করিতে করিতে নামিয়া গিয়াছি অবচেতনার সেই অস্পষ্ট অন্তর্লোকে, হেতু যেখানে অর্ধ-তন্দ্রা ও অর্ধ-জাগরণে শায়িত রহিয়াও অহরহ সক্রিয়। কারণ-সলিলে আজ আর অবগাহন করিব না, সে কার্য বারান্তরের জন্য গচ্ছিত রাখিয়া আজ আমার সন্ন্যাসগ্রহণসঙ্কল্প ও তাহার হাস্যকর ব্যর্থতার কাহিনী শোনাইব :

বহরমপুরে আমি তখন বিদ্যালয়ের অষ্টম অথবা নবম শ্রেণীর ছাত্র মাত্র। বিখ্যাত কীর্তনীয়া রামদাস বাবাজীর গুরুভ্রাতা এবং শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅদ্বৈতদাস বাবাজী সেই সময়ে

বহরমপুরে আসিলেন এবং গোরাবাজার ধর্মশালার সংলগ্ন যে শিব-মন্দিরে সাধু গোপালদাসজী থাকিতেন তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমি এবং আমার নিকটতম প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠতম বাল্যবন্ধু হরিদাস তাঁহার কীর্তন শুনিতে প্রত্যহ মন্দিরে যাইতাম, মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অপূর্ব কণ্ঠস্বর শুনিতাম, লক্ষ্য করিতাম—তাঁহার দুই নয়নে প্রেমাশ্রুর দরবিগলিত ধারা, সর্বাঙ্গে পুলকের রোমাঞ্চ শিহরণ। বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না যে, আমাদের মনের কাঠামোর সুস্পষ্ট পরিবর্তন সুরু হইয়াছে। একদিন তাঁহার কাছে সন্ন্যাসগ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া বাবাজীর পায়ে আমরা দুজনে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিলাম। দয়াপরবশ হইয়া তিনি আমাদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন : স্থির হইল, বহরমপুর ষ্টেশনে যাইবার পথের পার্শ্বে সাহেবদের যে গোরস্থান রহিয়াছে, বাবাজী সেদিন রাত্রে তাহারই কাছাকাছি কোথাও আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবেন এবং আমরা উভয়ে তথায় উপস্থিত হইলে আমাদিগকে লইয়া সুদূর যোশীমঠের উদ্দেশে যাত্রা করিবেন।

রাত্রিকালে যথাসময়ে আহারে বসিলাম, কিন্তু দারুণ উৎকণ্ঠায় ও আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ, বুক পরিপূর্ণ, খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণ করিতে পারিলাম না, ঘুমের ভাণ করিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গণিতেছি—কতক্ষণে বাড়ীর লোকজন ঘুমাইয়া পড়িবে, কতক্ষণে হরিদাস আসিয়া পথে দাঁড়াইয়া সঙ্কেত করিবে, ঘরের মায়া ও মনের মোহ ছিন্ন করিয়া কতক্ষণে বাহির হইয়া পড়িব সুদূর হিমাদ্রির পথে! পথ আমার দরজার পাশে দাঁড়াইয়া নামিয়া আসিতে আহ্বান করিতেছে, পাহাড় অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিতেছে তাহার অসীম রহস্য নিকেতনে! ক্রমে ক্রমে বাড়ীর লোকজন ঘুমাইয়া পড়িল, তাহাদের গভীর অথচ ছন্দোবদ্ধ

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু হরিদাস কই !

এমন সময় নীচের সদর দরজায় করাঘাতের শব্দ হইল, কিন্তু দরজায় করাঘাত করিয়া হরিদাসের তো সঙ্কেত জানাইবার কথা ছিল না। কথা ছিল, সে পথে দাঁড়াইয়া মৃদু ছন্দে করতালি বাজাইবে। তবে কি সঙ্কেতের কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে, এই ইসারায় সাড়া দিয়াই তবে কি আমি পথে নামিয়া পড়িব !

এমন সময় হঠাৎ করাঘাত-শব্দ কণ্ঠস্বরে পরিণত হইল এবং সে কণ্ঠস্বর চিনিতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না : হরিদাসের মামা মোক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় বাবার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। কেমন যেন একটা অজানা আতঙ্কে সারা দেহ শিহরিয়া উঠিল : হায় অদৃষ্ট ! যখন একান্ত মনে দেবতার ধ্যান করিতেছি, ঠিক সেই সময়ে অকস্মাৎ এই অপ-দেবতার আবির্ভাব হইল কোথা হইতে ! তবে কি সলা-পরামর্শ সব বেফাঁস হইয়া গিয়াছে ! আমার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না।

নগেনবাবুর ডাকে জাগিয়া উঠিয়া বাবা নীচে নামিয়া গেলেন। তারপর আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া যুগপৎ উকিল ও মোক্তারের জেরায় আমাকে যে নাজেহালী ভোগ করিতে হইল তাহার বিস্তৃত বিবরণ দান করিয়া সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিব না ; হতভাগা হরিদাসের দুর্বলতা ও বিশ্বাসঘাতকতা কেমন করিয়া আমার জীবনের বড় সাধে বাদ সাধিল তাহারই কাহিনী বিবৃত করি :

যাত্রার সময় যতই নিকট হইয়া আসিতেছে, হরিদাসের নিকট ততই প্রকট হইয়া উঠিতেছে সন্ন্যাসগ্রহণ-সঙ্কল্পের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য এবং সে-সঙ্কল্প শিথিল হইয়া আসিতেছে ঠিক সেই অনুপাতে :

এই ঘর থাকিবে, বাড়ী থাকিবে, আনন্দময় এই গৃহ-পরিবেশে মা-বাবা-ভাই-বোন সবাই থাকিবে, কেবলমাত্র থাকিবে না সে নিজে— একথা ভাবিতে গিয়া হরিদাস ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া পড়িল। আহারে রুচি হইল না, আহার না করিয়াই সে শয্যা আশ্রয় করিল।

মা আসিয়া ললাটে করস্পর্শ করিয়া দেখিলেন, জ্বরজনিত উত্তাপের লেশমাত্র সেখানে নাই। সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, সত্যি করিয়া বল্, তুই কেন খাইবি না, কি হইয়াছে তোর?

জননীর এ সোহাগ হরিদাস সহ্য করিতে পারিল না, মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, মা! আমার সঙ্গে তোমাদের এই শেষ দেখা, বিদায় দাও—আশীর্বাদ কর যেন···অনুক্ত বাকি কথাটা বাহির হইয়া আসিল উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগে।

আমাদের যাত্রার পরামর্শটা হরিদাস ফাঁস করিয়া দিল মায়ের কাছে, মা তাহা পৌঁছাইয়া দিলেন তাহার মামার কানে এবং মামা আসিয়া আমার বাবার সহযোগিতায় যে ভূমিকা অভিনয় করিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

যে ট্রেনে আমাদের যাত্রা করিবার কথা—রুদ্ধকক্ষে বন্দী হইয়া আমি শুনিতেছি বহরমপুর ষ্টেশনে আসিয়া তাহা সশব্দে প্রবেশ করিল, স-দাপটে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কিন্তু অদ্বৈতদাস বাবাজী এখন কোথায়! সমাধিক্ষেত্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি কি এখনও আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন!

সন্ন্যাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবার প্রতি অনুরাগ—বাহির হইতে এই দুইটি বস্তু যদিও নীতি-আকারে আমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে— তথাপি তাহাদের উৎস সন্ধান করিলে দেখিতে পাই একই সাধারণ-

ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া দুইটি পৃথক্ ধারায় তাহারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; দুইটি প্রবাহেরই জন্ম মাতৃহীন শিশুর আশৈশব বঞ্চনা ও বেদনার বিশুষ্ক-মরু-বালুকায়, তাই সে-ধারা আনন্দের অলকানন্দা নয়, বেদনার অশ্রুমতী। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে—দুইটি ধারা যেখানে আসিয়া মিলিত হইয়া পবিত্র সঙ্গমতীর্থ রচনা করিয়াছে:

সে ঘটনার কাল পূর্বোল্লিখিত ঘটনারও কিছু পূর্ববর্তী!

একদিন বাৎসরিক পরীক্ষা শেষে সন্ধ্যাবেলায় সহপাঠি ধীরেনের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছি; তাহাদের বাড়ী গোরাবাজার ধর্মশালার ঠিক সংলগ্ন। কিছুটা রাত্রি হইলে বাড়ী ফিরিতেছি, ধর্মশালার নিকটে আসিয়া শুনিতে পাইলাম ভিতরে অব্যক্ত যন্ত্রণায় কে যেন গোঙাইতেছে। অন্ধকারে একা ঢুকিতে সাহস হইল না, ধীরেনদের চাকর কালীকে আলো লইয়া আসিতে বলিলাম, সে আলোটি আমার হাতে ধরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

লণ্ঠন হাতে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, বারান্দার খেপা সাধুটা একেবারে তাল-গোল পাকাইয়া পুঁটলী হইয়া গিয়াছে আর তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে অস্ফুট আর্তনাদ ও অজস্র ফেনা। গায়ে হাত দিয়া অনুভব করিলাম—অসহ্য উত্তাপ, কুণ্ডলীকৃত দেহটা প্রচণ্ড কাঁপনে কম্পিত হইতেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিলাম, ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই তাহার প্রতিকার ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হইলাম। গায়ের চাপাপড়া কম্বলখানা পিঠের তলা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া খেপার সর্বাঙ্গে জড়াইয়া দিলাম এবং কম্পমান দেহটাকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিলাম নিজের বুকে।

ভূতের আস্তানা হিসাবে ধর্মশালার কুখ্যাতি প্রবাদবিদিত; তাহারই

এক অন্ধকার কুঠুরিতে খেপা এক সাধুকে বুকে জড়াইয়া একলা বসিয়া থাকিতে ভয়ে গা ছম্‌ছম্ করিতেছে, কিন্তু এই অসহায় অবস্থায় তাহাকে একাকী ফেলিয়া চলিয়াই বা যাই কিরূপে !

কিছুক্ষণ পরে কাঁপন কমিল, সাধু চোখ মেলিয়া গভীর আগ্রহের সহিত আমাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পরিচয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল তাঁহার চোখে মুখে, তিনি জল খাইতে চাহিলেন। গঙ্গা হইতে জল আনিয়া খড় জ্বালাইয়া তাহা তাতাইয়া লইলাম। ঈষদুষ্ণ জল পান করিয়া সাধু উঠিয়া বসিলেন, সস্নেহে গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, রাত্রি অনেক হইয়াছে, তুই এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যা, আমি ভাল আছি এবং ভালই থাকিব।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় জাল-দেওয়া আধসের দুধ হাতে লইয়া সাধুকে দেখিতে গেলাম। সাধু সেদিন বেশ সুস্থ, তবু দুধ পান করিবার পর তিনি বলিলেন, বাবা, আমার যাইবার সময় হইয়াছে, বেলডাঙ্গায় এই নাম ও ঠিকানায় আমার এক মুসলমান শিষ্য আছে—তাহাকে আসিবার জন্য একখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়া দে এবং সৈদাবাদের এই নামের জনৈক ভদ্রলোককে এখানে ডাকিয়া আন্।

অবাক হইয়া ভাবিতেছি···একী অদ্ভুত কাণ্ড! যাহাকে আমরা নেহাৎ খেপা বলিয়াই জানিতাম, পথে বালকবৃন্দ দুই হাতে তাহার গায়ে ছাই-ভস্ম ও ধূলা-মাটী ছড়াইলে যে বালকমণ্ডলির মধ্যে দাঁড়াইয়া আনন্দে দুই হাত তুলিয়া উদ্দাম নৃত্য করিত, দুইটি কাঠি দুই নাকে প্রবেশ করাইয়া দিয়া যে অনবরত থুথু ও কফ-কাসের দুর্ভেদ্য ব্যূহ নিজের চারিধারে রচনা করিয়া রাখিত—তাহারও আবার ভক্ত-শিষ্য ও অনুরক্ত আছে নাকি! আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই—বিরাটতর আর এক বিস্ময় আমার প্রতীক্ষায় পথের বাঁকে দাঁড়াইয়া আছে!

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সাধু বলিলেন, বোস, তোকে আজ একটা গল্প শোনাই: পুরাকালে এক রাজার রাজ্যে একদা দারুণ অনাবৃষ্টি দেখা দেয়; তাহার ফলে শস্যহানি হওয়ার দরুণ রাজ্যে দেখা দিল দারুণ দুর্ভিক্ষ। অনশনক্লিষ্ট প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নাই, অথচ রাজা নিরুপায়, সে-দুঃখ দূর করিবার মত না আছে রাজভাণ্ডারে প্রচুর শস্যের সঞ্চয়, না আছে রাজকোষে পর্যাপ্ত অর্থের সঙ্গতি। রাজা অনুপায় হইয়া দেব-তুষ্টির জন্য শেষ পর্যন্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানও ঈপ্সিত ফললাভে সমর্থ হইল না।

যজ্ঞানুষ্ঠানে সমাগত মুনিদের মধ্যে একজন তখন রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি এক কাজ করুন, প্রতিদিন আপনার প্রাসাদের ছাদে কিছুটা করিয়া চাল ছিটান, সে চাল খাইবার জন্য কাক আসিবে, কোকিল আসিবে, আরও অন্যান্য অনেক পাখী আসিবে, অবশেষে সে খবর একদিন গিয়া পৌঁছাইবে শুক পাখীর কাছে, আপনার প্রাসাদ লক্ষ্য করিয়া শুক পাখী পাখা মেলিবে; সে আপনার রাজ্য-সীমায় প্রবেশ করিবামাত্র আকাশের এক প্রান্তে মেঘ দেখা দিবে; প্রাসাদের ছাদে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে সারা আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইবে এবং চাল খাওয়া শেষ করিয়া আবার যেই আকাশে পক্ষ বিস্তার করিবে, তৎক্ষণাৎ মুষলধারে নামিবে প্রার্থিত বর্ষণ, সে ধারায় ধরণী আবার তাহার হারাণো উর্বরতা ফিরিয়া পাইয়া শস্যশালিনী হইবে, স্বর্ণপ্রসবিনী হইবে।

কাহিনী কখন থামিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারি নাই। আমি শুধু অবাক হইয়া ভাবিতেছি, সাধুর এই দুর্বোধ্য খেপামীর কথা, বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে কথিত এই কাহিনীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা।

সম্ভবত আমার বিমূঢ় অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই সাধু বলিলেন, বাবা, তোর মধ্যে সেবার বৃত্তি আছে, খেপার একটা কথা মনে রাখিস : সে বৃত্তিকে যেমন করিয়া হোক, বাঁচাইয়া রাখ ; চলার পথে দুই হাতে সেবা বিলাইয়া যা, তোরও জীবন-সৌধের-শিখরে আমাদের মত কাক-কোকিল আসিতে আসিতে একদিন সত্য সত্যই শুকপাখীর আবির্ভাব হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তোর জীবনের ঊষর-মরুর বুকে নামিবে কল্যাণ-আশীর্বাদের অজস্র বর্ষণ ; সে ধারায় তৃষিত ও তাপিত জীবন-মরুভূমি তোর তৃপ্ত হইবে, শান্ত হইবে, সার্থক হইবে !

রাত্রির প্রথম যাম অতিক্রান্তপ্রায়, বাহিরের পথ নির্জন হইয়া আসিতেছে। ভিতরে কক্ষের নিস্তব্ধতা নিবিড়তর ; খেপার চোখে এক স্বপ্নাতুর মুগ্ধ-দৃষ্টি, মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে এক পরিতৃপ্ত প্রসন্নতা। আর আমি ! কৈশোর ও যৌবনের যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া আমি তখন শুনিতেছি, জীবন-আকাশের দূর এক প্রান্তে অনাগত শুকপক্ষীর পক্ষ-স্বননের অনাহত সঙ্গীত।

পাঁচ

চাঁদীর চামোচ

পূর্বেই বলিয়াছি, চাঁদীর চামোচ মুখে লইয়া আমি মাটিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু যে পরিহাস-প্রগল্‌ভা-নিয়তি আজন্ম আমার নিত্যসঙ্গিনী, তাহার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ-কৌতুকে বিদ্ধ হইয়া অধরের পক্ষে তাহা অধিকদিন ধরিয়া রাখা সম্ভব হইল না, যেমন সাড়ম্বরে সে একদা আমার মুখে আসিয়াছিল, তেমনি সানুষ্ঠানেই সে একদিন তথা হইতে খসিয়া পড়িল মাটিতে। সে-দুর্ঘটনার জন্য আমার আত্মীয়-বন্ধু ও শুভেচ্ছুগণ হয়তো বেদনাবোধ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সে সমবেদনা নেহাৎ সামাজিক অনুষ্ঠান; আমার প্রতি বিরূপ বিদ্বিষ্ট ব্যক্তিগণ হয়তো আমাকে বঞ্চিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু সে আনন্দ আন্তরিকতাহীন ও ঈর্ষাপ্রসূত। মুখ-লগ্ন চাঁদীর চামোচকে মুখ হইতে মাটিতে স্খলিত হইতে দেখিয়া সেদিন যদি কেহ সত্যসত্যই উল্লসিত হইয়া থাকে—তবে তাহা হইয়াছিল আমার বুকের বিবাগী বাউল! আনন্দে একতারা বাজাইয়া নাচিয়া-গাহিয়া সে অন্তরের আসর মাতাইয়া তুলিয়াছিল: পথের মানুষ হওয়াই যাহার বিধি-নির্ধারিত ভাগ্যলিপি, চাঁদীর চামোচ তাহার মুখকে ব্যঙ্গ করে!

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়বেতা গ্রামে মাতুলালয়ে আমার জন্ম, সেখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া আট বৎসর বয়স অবধি আমি সেইখানেই লালিত-পালিত হই। কিন্তু সে-গৃহকে মাতুলালয় বলিলে বোধ হয় ঠিক বলা হইবে না। তাহা আমার মাতামহীর পিত্রালয়। আমার মাতামহ অপুত্রক-ধনীর একমাত্র-সন্তান আমার মাতামহীকে বিবাহ করিয়া ঘর-জামাই ছিলেন

বলিয়া আমার মাতুলরাও আমারই মত সেই আলয়ে ভূমিষ্ঠ ও বর্ধিত হন। আমার মাতামহীর পিতা শ্রীদীনদয়াল অগস্তী সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় দানশীল ও বিত্তশালী ব্যক্তিরূপে বিখ্যাত ছিলেন :

হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর, সিপাই-সান্ত্রী, পশুশালা ও চিড়িয়াখানা, বারো মাসে অনুষ্ঠিত তের পার্বণের বিপুল উৎসব-সমারোহ দেখিয়া আগন্তুকগণের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব হইত যে, মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর অধীন তিনি এক ক্ষুদ্র আয়মাদার মাত্র; তাঁহার প্রভাব এবং প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য এবং প্রাচুর্য তাঁহার চতুর্দিকে যে বিপুল সমারোহ রচনা করিয়া রাখিত—তাহা কেবল দেশীয় কোন করদ-মিত্র রাজার পক্ষেই সম্ভব। ধনীর একমাত্র সন্তানরূপে আমার মাতামহী ছিলেন তাঁহার সমগ্র স্নেহ-সঞ্চয়ের সর্বস্বত্ব সংরক্ষয়িত্রী; মাতামহীর প্রথমা সন্তানরূপে আমার জননী ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্নেহের সে একক ধারা দ্বিধা-বিভক্ত হইল এবং আমি জন্মগ্রহণ করিলে স্নেহের সলিল ফিল্টারের উপরিভাগের দুইটি কলসী চোয়াইয়া নিঃশেষে আশ্রয় গ্রহণ করিল—সর্বনিম্নস্থ তৃতীয় আধারে।

মাত্র দেড় বৎসর বয়সে আমি মাতৃহারা হইলাম। জননীর অভাব আমি বোধ করিয়াছিলাম কিনা জানিনা, কিন্তু বৃদ্ধের জীবনে তাহা যে বিরাট শূণ্যতা রাখিয়া গেল—তিনি তাহা ভরিয়া তুলিতে চাহিলেন—ক্ষুদ্র এই শিশুর ক্ষীণ উপস্থিতি দিয়া!

বলাবাহুল্য, সে-সাধনায় তিনি আশাতীত সাফল্যলাভ করিলেন। আমার সত্তা সে শূণ্যতা অতি সহজে পূর্ণ করিয়া বৃদ্ধের সমগ্র জীবন আচ্ছন্ন করিয়া বসিল; আমার সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান সত্তার নিকট পরাজয় বরণ করিয়া আমার মাতামহী ও মাতুলগণ সসঙ্কোচে রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া নেপথ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জনসাধারণের বুঝিতে বাকী

রহিল না যে, সে বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের আমিই একমাত্র চিহ্নিত উত্তরাধিকারী। ইহা হইল বৃদ্ধের জীবন আখ্যায়িকার চিত্রের একদিক : অপর দিকে শিশুর মনোরাজ্যেও তখন অসীম রহস্য ধীরে ধীরে ঘনাইয়া উঠিতেছে। অজ্ঞান অবস্থা হইতে যে ধারণা আমার অন্তর্লোকে হয়তো বিরাজ করিতেছিল অস্পষ্ট নীহারিকার মত, জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা ফুটিয়া উঠিল সুস্পষ্ট তারকার আকারে :

আমি বুঝিলাম, বৃদ্ধই আমার পিতা এবং তাঁহার জীবিতা দুই পত্নীর মধ্যে প্রথমা আমার মাতা ; তাঁহারা ছাড়া অন্য কোন মাতা অথবা পিতা যে কেহ কোথাও আমার আছে বা ছিল সে ধারণার লেশমাত্র আমার মনে তৎপূর্বে কোনদিন ছায়াপাত করে নাই।

অচিরে এক বিচিত্র ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া সে-সংশয়ের সূত্রপাত হইল : আমার বয়স তখন সাত বৎসর, অপরিচিত এক আত্মীয় আমাদের বাড়ীতে আসিলেন এবং দেখিতে চাহিলেন—আমার লেখাপড়া কেমন চালতেছে।

নীলকণ্ঠ পণ্ডিতমহাশয়সহ আমি পুঁথিপত্র লইয়া তাঁহার কাছে হাজির হইলাম ; তিনি আমাকে দ্বিতীয়ভাগ হইতে কিছুটা অংশ পড়িতে বলিলেন, বানান জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যতদূর মনে পড়ে ধারাপাত হইতেও কিছু কিছু প্রশ্ন করিলেন। কেমন জবাব দিলাম জানিনা, তবে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া মনে হইল, জবাব সম্ভবত মন্দ হয় নাই। পড়া দিয়া ঘর হইতে যখন বাহির হইতেছি, জনৈক আত্মীয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবাগত ওই ভদ্রলোকটিকে আমি চিনি কিনা!

উদাসীন ও অনাসক্তভাবে আমি ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম, ভাবিলাম আমাদের এই বাড়ীতে প্রতিদিন কত আত্মীয়ই যে আসা-যাওয়া

করে কে তাহার হিসাব রাখে! যদু মামা আমার নির্বুদ্ধিতার জন্য ধিক্কার জানাইয়া বলিলেন, বোকা ছেলে, নিজের বাপকে চেননা, উনি যে তোমার বাবা হন।

বাবা হন! যদু মামা বলেন কি! কথা শুনিয়া যে কেবলমাত্র অবাকই হইলাম তাহা নয়, অপরিচিত এক ভদ্রলোককে আমার পিতৃত্বে বরণ করার জন্য মনে মনে আমি ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করিলাম।

কথাপ্রসঙ্গে কুষ্টিয়ার একটি অনুরূপ ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল: আমার বাবা অর্থাৎ প্রাক্তন মেসোমশাই তখন কুষ্টিয়া ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, আমি সবে মাত্র সকালে কুষ্টিয়ায় পৌছিয়াছি এবং বিকালে সমবয়স্ক এক প্রতিবেশী বালকের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। রাস্তায় জনকয়েক ছেলের সহিত সাক্ষাত হইলে তাহাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গী-বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, এডা কেরে, হেড মাষ্টারের পোলা নাকি। পোলা অর্থে যে ছেলে, সে তত্ত্ব আমার তখন জানা ছিল না। তাহা ছাড়া, কেমন যেন একটা গালা-গালির গন্ধ তাহার মধ্যে পাইলাম এবং ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম জিজ্ঞাসু-বালকটির উপর। সকলে মিলিয়া আমাকে থামাইয়া দিল বটে, কিন্তু আমার আকস্মিক ক্রোধের কারণটা সম্ভবত কেহই অনুমান করিতে পারিল না। পরের দিন সকালে বাসার ভিতর বসিয়া শুনিতে পাইলাম, বাইরের ঘর হইতে বাবা আমাকে ডাকিতেছেন। সেখানে গিয়া দেখি, কল্যকার সেই প্রহৃত বালকটি বাবার সম্মুখে দণ্ডায়মান। বুঝিতে বাকি রহিল না যে, নালিশ ইতিপূর্বেই দায়ের হইয়া গিয়াছে। বাবার প্রশ্নের জবাবে আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম যে বালকটিকে আমি মারিয়াছি, কারণ সে আমাকে গালাগালি দিয়াছিল। বাবা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, কাল তুই সবেমাত্র এখানে আসিয়াছিস,

প্রথম দেখা-সাক্ষাতেই সে তোকে অকারণে গালাগালি দিতে যাইবে কেন? বল, সে তোকে কি বলিয়া গালাগালি দিয়াছিল? অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত আমি তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলাম, সে আমাকে হেড মাষ্টারের—বাকী কথাটুকু লজ্জায় বলিয়া উঠিতে পারিলাম না, রসনায় বাধিয়া গেল। বাবা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তোকে হেড মাষ্টারের কি বলিয়াছিল? লজ্জার মাথা খাইয়া বলিলাম, সে বলিয়াছিল—হেড মাষ্টারের পোলা। বাবা উচ্চহাস্যে ঘরখানা কাঁপাইয়া তুলিয়া বলিলেন, বেকুব কোথাকার, তোকে হেড মাষ্টারের পোলা না বলিয়া কাহার পোলা বলিবে? আমি অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ছি-ছি বাবার মুখেও সেই কথা! ব্যাপারটা সঠিক অনুধাবন করিয়া লইয়া বাবা বাদী বালকটিকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, দেখ, ও সবেমাত্র তোমাদের এখানে আসিয়াছে। তোমাদের কথা ভালভাবে বুঝে না, তাই 'পোলা' কথাটার মানে না বুঝিতে পারিয়া সে মনে করিয়াছে ওটা হয়ত একটা গালাগালি হইবে। বাবা আমাদের দু'জনের হাত মিলাইয়া দিলে ভুলের প্রহসনের যবনিকা সেইখানে পাত হইয়া গেল।

পুনরায় পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি: অপমানজনক আপ্যায়নে ক্ষুব্ধ হইয়া যদু মামার উপরেও যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু যে কোন কারণে হোক, সে ঝোঁক সামলাইয়া লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করিলাম আমার পালক-পিতার নিকট। অভিযোগ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং নগদি পাঠাইলেন যদুমামাকে ধরিয়া আনিবার জন্য; ইতিমধ্যে নবাগত ভদ্রলোকটির পরিচয় দিবার জন্য তিনি আমাকে কোলে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, দেখ রে, তোর এক মাসী ছিল, সে অনেক আগে মারা গিয়াছে। তুই তাহাকে দেখিস নাই···বৃদ্ধের মুখ দিয়া আর কথা সরিল না, মুখে তোয়ালে চাপা

দিয়া ছোট ছেলের মত ফুলিয়া ফুলিয়া ও ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রবলপ্রতাপ যে জমিদারের সম্মুখে লোকে সোজা হইয়া হাঁটিতে সাহস পায় না—এ হেন সিংহরাশি পুরুষ যে অসহায় শিশুর মত এমন করিয়া কাঁদিতে পারে আমি চোখে দেখিয়াও তাহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলাম না, কেমন যেন হক-চকিয়া হাবা বনিয়া গেলাম। বৃদ্ধ একটু সাব্যস্ত হইয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, তোর সেই মাসীর সঙ্গে এই ভদ্রলোকের বিবাহ হইয়াছিল। ইনি তোর মেসোমশাই। বাবার সঙ্গে আমার নূতন সম্বন্ধের সূত্রপাত এইখানে এবং এইখানেই আমার মনের প্রভাত-আকাশে সংশয়ের প্রথম মেঘ-সঞ্চার!

ছয়

চাঁদীর চামোচ মুখচ্যুত

মাত্র কয়েকদিন আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া মেসোমশাই আবার চলিয়া গেলেন এবং যাইবার পূর্বে কোলে লইয়া সস্নেহে পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কত কথা বলিতে লাগিলেন। কোলে বসিয়াই লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার দুই চোখে জল টলমল করিতেছে; মনে পড়িয়া গেল সেদিন বাবার কান্নার কথা। সত্য কথা বলিতে কি, মেসোমশাই ভদ্রলোকটিকে আমার ভারি ভাল লাগিয়াছিল। আমাদের বাড়ীতে কত আত্মীয়-স্বজনই তো আসা-যাওয়া করেন, কিন্তু কই, এমন নিবিড় করিয়া তো কেহ কাছে টানেন না, এমন আদর করিয়া কেহই তো কোলে লন না, এমন জল-ভরা চোখে কেহই তো আমার মুখের দিকে

চাহিয়া থাকেন না! জীবনের এক প্রান্তে এই যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি ঘটিয়া গেল তাহার এক বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল জীবনের অপর এক প্রান্তে: অন্তরের আলো-ছায়ার মায়ালোকে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল এক অপূর্ব নারী-মূর্তি! মনে হইল, কবে কোন্ বিগত দিনে সেই নারীমূর্তি যেন আমাকে কোলে লইয়া মন্দির-আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া আছেন আর আমি যেন তাঁহার কোল হইতে হাত বাড়াইয়া হাতীর শুঁড়ে হাত বুলাইতেছি। ইহা স্বপ্ন না জাগরণ জানি না, তবে ইহা জানি যে, সে-ছবি প্রায়ই আমার মনের পটে জাগিত ও মিলাইত, ভাসিত ও ডুবিত। অবশ্য মন্দির-আঙ্গিনায় হাতীটিকে যে লইয়া আসা হইত ইহা বাস্তব ঘটনা:

প্রতি বৎসর বিজয়া দশমীর দিন হাতীর কপাল ও শুঁড় বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করা হইত। দুই দাঁতের অগ্রভাগে পরাইয়া দেওয়া হইত পিতলের খাপ, পিঠে ঝালর-শোভিত মখমলের আস্তরণ বিছাইয়া তাহাকে লইয়া আসা হইত মন্দির-আঙ্গিনায়; অন্তঃপুরের মহিলারা তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইতেন। সুবেশ-সজ্জিত মাহুতও তাহার আপন প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইত না। কিন্তু তাহার মধ্যে এই নারীমূর্তি আসিল কোথা হইতে এবং আমিই বা তাঁহার অঙ্কে স্থান লাভ করিলাম কেমন করিয়া। অন্তঃপুরের কোন মহিলার সহিত তাঁহার আকৃতিগত কোন সাদৃশ্য খুঁজিয়া না পাইয়া বিহ্বল হইয়া ভাবিতাম, কে এই নারী, কে—কে ইনি!

সহসা একদা সুখ ও শান্তিপূর্ণ, সম্পদ ও সৌভাগ্যপূর্ণ সেই সংসার পরিবেশে যে প্রলয়-তুফান জাগিয়া উঠিল, তাহার প্রচণ্ড আঘাতে যে শুধু আমার স্বপ্নদৃষ্ট কল্পনার ছবিটিই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল তাহা নয়, আমার জীবন-তরণীও তীরবেগে লক্ষ্যহীন ছুটিয়া চলিল নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত। আমার পালক-পিতা সহসা একদা পরলোকগত

হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যে বিশাল সংসারটিকে তিনি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে আনিয়া ইঙ্গিতে পরিচালনা করিতেন—কেন্দ্রচ্যুত উল্‌কাপিণ্ডের মত তাহা মহাশূন্যে ধাবিত হইল আপনার অন্তর্দাহে ক্ষিপ্ত হইয়া; যেখানে বিরাজ করিত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গৃহস্বামীর স্বহস্ত-বিরচিত বিধি-নিষেধের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, সেখানে দিবা-দ্বিপ্রহরে সুরু হইয়া গেল প্রেতের উন্মত্ত তাণ্ডব। যে দুইটি বিরোধী-স্বার্থের সংঘাতে এই আলোড়নের সৃষ্টি তাহার এক পক্ষে রহিলেন আমার মাতামহ, মাতামহী ও মাতুলগণ এবং অপর পক্ষে দাঁড়াইলেন আমার সদ্য-পরলোকগত পালক পিতার দুই পত্নী এবং তাঁহাদের পিতৃকুল। বলা বাহুল্য, আমি আশ্রয় লইলাম শেষোক্ত পক্ষের পক্ষপুটে: সদ্য পিতৃহারা শিশুর অসহায় দৃষ্টির সম্মুখে বিধবা মাতা ছাড়া তখন অন্য কোন আত্মীয়ের অস্তিত্ব কোথায়! মাতামহ, মাতামহী ও মাতুলদের সহিত আমার যে সম্পর্ক নিতান্ত গ্রাম-সুবাদে পাতানো তাহা ধর্ম সম্বন্ধ মাত্র।

সংসারের কর্তৃত্ব লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে যে বিরোধের সূত্রপাত তাহা সংঘর্ষের আকারে আত্মপ্রকাশ করিল উইলকে উপলক্ষ্য করিয়া। মাতামহ যে উইলখানা আদালতে ও জনসমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন তাহার বলে ৺দীনদয়াল স্বগন্তীর দেবোত্তর সম্পত্তির তিনিই একমাত্র মনোনীত সেবাইৎ। অপরপক্ষ সে-উইলের সত্যতা সরাসরি অস্বীকার করিয়া বলিলেন, উহা জাল এবং জাল উইল প্রস্তুত হইয়াছে উইলকর্তার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে। জাল উইল রচনা সম্পর্কে বিরোধীপক্ষ যে কাহিনী রটনা করিলেন বিলাতী গোয়েন্দা-গল্পের মতই তাহা রোমাঞ্চকর: তাঁহারা বলেন, দলিল-সম্পাদনের পর তাহা সংশ্লিষ্ট-পক্ষগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরের অভ্যন্তরে বসিয়া;

সাক্ষীগণ গোপনীয়তা রক্ষার জন্য দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ করিবার পর যথারীতি উইলে স্বাক্ষর করিলেন। সর্বশেষে উইলকর্তার নিজের স্বাক্ষর দলিলের পৃষ্ঠে অঙ্কিত করিবার পালা! এষ্টেটের একজন মাত্র অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ গোমস্তা ছিলেন—যিনি গৃহস্বামীর স্বাক্ষর হুবহু জাল করিতে পারিতেন। দুর্যোগ-রাত্রির বন্যাপ্লাবিত নদী সন্তরণ করিয়া কোন একজন ব্যক্তি অপর পারে গেলেন এবং বৃদ্ধ-গোমস্তাকে পিঠে লইয়া অন্ধকার নদী সাঁতরাইয়া পুনরায় এপারে ফিরিয়া আসিলেন; বন্যার বেগে নদীর খেয়া তখন অচল; তাহা ছাড়া, এরূপ গোপনীয় কাজের পক্ষে প্রকাশ্য সে-খেয়া অব্যবহার্য। বৃদ্ধ গোমস্তা মৃত মালিকের নাম স্বাক্ষর করিয়া উইল-সম্পাদনের শেষ পর্যায় সম্পন্ন করিলেন। বিরোধী-পক্ষের মতে, ইহা নাকি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ! তাঁহারা বলেন, তাঁহাদেরই পক্ষভুক্ত জনৈক ব্যক্তি সেদিন গভীর রাত্রে মন্দিরের পথে বহু লোকের আনাগোনার আওয়াজ পাইয়া ও বহু আলোর জ্বলা-নেভা প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য সন্তর্পণে পা টিপিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন; দেউড়ির নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র কে বা কাহারা তাঁহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল এবং সেই অবস্থায় মন্দিরের মধ্যে বহন করিয়া লইয়া গেল; বলীর খড়্গ তাঁহার মাথার উপরে উদ্যত, সেই অবস্থায় নীরবে বসিয়া দলিল-সম্পাদনের গোপন-লীলা তিনি নাকি সুরু হইতে শেষ অবধি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন।

দলিল বস্তুতঃ সত্য হোক অথবা মিথ্যা হোক, মামলাসূত্রে হাইকোর্টে তাহার সত্যতা স্বীকৃত হইয়া গেল এবং উইলের সর্তবলে আমার মাতামহ আসিয়া গদী অধিকার করিলেন। ইতিমধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়া গেল: একদিন গভীর রাত্রে বাড়ীতে ডাকাত পড়িল; হাতুড়ির ঘায়ে ঘরের তালা ভাঙ্গার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে চোখ

মেলিয়া দেখি, আমার মা তখন তাড়াতাড়ি বন্দুক গাদিতেছেন ; গাদা শেষ হইলে দরজার ঘুল-ঘুলিতে নল রাখিয়া বন্দুক পুনঃপুনঃ গর্জন করিতে লাগিল। আমি সভয়ে হামাগুড়ি দিয়া খাটের তলায় যাইয়া আশ্রয় লইলাম। হাতুড়ির আঘাতের আওয়াজ, বন্দুকের গর্জন ও বন্ধ ঘরের বন্দী লোকজনের আর্ত চিৎকার—একত্রে মিলিয়া যে বীভৎস নৈশ বিভীষিকা সেদিন সৃষ্টি করিয়াছিল আজও তাহার আতঙ্ক-জনক স্মৃতি আমার মনে মুদ্রিত রহিয়াছে। সে-শব্দে বাহিরের লোকজন আকৃষ্ট হইলে ডাকাতদল পলায়ন করিল বটে, কিন্তু যাইবার পূর্বে বিশ্বনাথ মামাকে, অর্থাৎ দীনদয়াল অগস্তীর প্রথমা পত্নীর ভ্রাতাকে সাংঘাতিকভাবে আহত ও মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়া গেল। ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখি, তিনি বারান্দায় শোণিত-স্রোতে শায়িত রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে আহত ব্যক্তির জামাতা ও তাঁহাদের স্বজনবর্গ বাড়ীর ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন ; দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের সহিত আমার মাতুলদের সংঘর্ষ বাধিয়া গেল, উভয় পক্ষ হইতেই লাঠি চলিতে লাগিল খোলা হাতে। বিভীষিকাময় রাত্রির অবসানে ভোর আসিল বুদ্ধ-শান্তির বাণী বহন করিয়া এবং সারা রাত্রির বিক্ষুব্ধ ভবন ভরিয়া যে শান্তি নামিয়া আসিল—তাহা শ্মশানভূমির, গৃহ পরিবেশের নয়। অতঃপর সুরু হইল মামলার পালা : মাতামহ ও মাতুলগণ সে মামলায় আসামী হইয়া বনে-জঙ্গলে আত্মগোপন করিলেন। এই সময়ের একটি মজার ঘটনা মনে পড়িয়া গেল ; আমি এবং আমার ছোট মামা দোতলার ঘরে বল খেলিতেছি ; বলটি হঠাৎ খাটের তলায় ঢুকিয়া গেলে বাহির করিতে গিয়া দেখি, খাটের চাদরখানা একদিকে প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝোলান রহিয়াছে ; চাদর তুলিতেই চোখে পড়িয়া গেল, খাটের তলায় অবস্থিত এক মনুষ্য মূর্তি ; তাঁহাকে মেজমামা বলিয়া

চিনিতে পারিয়াও ভয়ে চিৎকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে চিৎকারে দিদিমা ছুটিয়া আসিলেন, ব্যাপারটা মুহূর্তে বুঝিয়া লইয়া আমাকে তেতলার ছাদে লইয়া গিয়া মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন, আমি যেন মেজমামার কথা কাহারও নিকট না বলি; কারণ ফেরারী আসামী বাড়ী আসিয়াছে জানিলে পুলিশ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।

কালক্রমে ফৌজদারী মামলার যবনিকাপাত হইল, মাতামহ ও মাতুলরা অভিযোগ হইতে মুক্তি পাইলেন, মাতামহ হইলেন দীনদয়াল অগস্তীর শূন্যগদীর অধীশ্বর; অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার রাজ্যে ধীরে ধীরে নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতে লাগিল এবং দুই রাজার শাসনকালে বিশাল জমিদারীকে দানবীয় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের যে নিদারুণ বিভীষিকা গ্রাস করিয়াছিল তাহা অতি ধীরে অন্তর্হিত হইয়া স্থান ত্যাগ করিতে লাগিল স্বাভাবিক শান্ত ও সুস্থ পরিবেশের অনুকূলে। জমিদারী ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু দীর্ঘ দুই বৎসরব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বে এমন ক্ষত-বিক্ষত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল যে, সে আঘাত শেষ পর্যন্ত সামলাইয়া উঠা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না, তাসের ঘরের মত তাহা স্তরে স্তরে চোখের সামনে ধ্বসিয়া পড়িল। বর্তমান ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আজ আর ধারণা করিতে পারিনা যে, ইহারই বুকে একদা সেই সোনার সংসার মহা সমারহে বিরাজ করিত!

আমার পালক-পিতার জীবিত দুই পত্নী অধিকার ও আধিপত্য-চ্যুত হইয়া সে-সংসার হইতে দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন; সেই সঙ্গে আমিও আমার মায়ের অঞ্চল ধরিয়া পথে বাহির হইলাম, পশ্চাতে পড়িয়া রহিল আমার সুখের ভগ্ন-নীড় ও মুখের চাঁদীর চামচ। মা আমাকে আঁচলে বাঁধিয়া আশ্রয় লইলেন বাঁকুড়ায় তাঁহার ভ্রাতৃগৃহে। এই সেদিনও যে-

বালক অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করিয়াছে রৌপ্যপাত্রে—রাজার সেই একমাত্র স্নেহের দুলাল আজ পরের উচ্ছিষ্টভোজী পথকুকুর ছাড়া আর কিছু নয়! আমার দুঃখ-দুর্দশার কথা যথাসময়ে আমার সেই মেসোমহাশয়ের কানে গিয়া পৌছিল, তিনি তখন কুষ্টিয়া ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। শুনিলাম, মেসোমশাই আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার জন্য শীঘ্রই এখানে আসিতেছেন। কিন্তু মাকে ছাড়িয়া তাঁহার সহিত আমি কোথায় যাইব, কেনই বা যাইব! তাঁহার সহিত আমার একদিনের মাত্র পরিচয় বই তো নয়! মেসোমশাই একদা সত্য সত্যই আসিলেন এবং আসিলেন একদল জগন্নাথের যাত্রী সঙ্গে লইয়া; শুনিলাম, তাঁহারা নাকি আমার মেসো-মহাশয়েরই মা, বাবা ও আত্মীয়স্বজন। যাত্রার ক্ষণে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে এমন নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিলাম যে, সে-বাহুবন্ধন হইতে আমাকে ছিনাইয়া লইবার মত কঠোরতা কেহ সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারিল না। সে-ট্রেন ফেল হইয়া গেল; পরের গাড়ীতে যাইতেই হইবে, কিন্তু তবু তো একটি রাত মায়ের কোলে শুইতে পাইব, তবু তো একটি দিন মাতৃস্নেহের বাঞ্ছিত স্বর্গে বাস করিতে পারিব!

পরের দিন যথাসময়ে গাড়ীতে উঠিলাম; কিন্তু কাঁদনের আমার বিরাম নাই। মা অতিকষ্টে আমারই মুখ চাহিয়া এতক্ষণ ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী বাড়ীর দরজা ছাড়িবামাত্র তিনি ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন: ওরে বাবারে! এ যে আমার অক্রুর বিদায়!

...গাড়ী ষ্টেশনের অভিমুখে ছুটিয়া চলিল, কিন্তু কানের পর্দায় ও প্রাণের তন্ত্রীতে বাজিতে লাগিল সেই ক্রন্দনের করুণ রেশ!

কোন্ স্টেশনে নামিয়া গাড়ী বদল করিতে হইল আজ আর মনে নাই; শুধু মনে আছে সেই স্টেশনের একটি ঘটনার কথা—যাহার আঘাত আমার

জীবনের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিয়া বিমূঢ় দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিল এক নূতন জগতের আভাস :

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে বসিয়া মায়ের জন্ম ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছি। লোকের আসা-যাওয়া, জনতার ভীড় অথবা ট্রেনের গতি-বিধি কিছুই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে না, একা মা বিনে বিশ্ব-সংসার আমার চোখে শূন্য! মেসোমশাই সেই অবস্থায় আমাকে দেখিতে পাইয়া কাছে আসিয়া বসিলেন, কোলে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে চোখের জল মুছাইয়া অশ্রুসিক্ত গণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন, তুই এমন কাতর হইয়া কেন কাঁদিতেছিস্ বল, কাহার জন্ম তোর এই কান্না? উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগেই উত্তর করিলাম, মায়ের জন্ম, আমি মায়ের কাছে যাইব, আমাকে রাখিয়া আসুন তাঁহার কাছে···। এই কথা শুনিবামাত্র মেসো মহাশয়ের রুদ্ধ ভাবাবেগ সশব্দে ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন, ওরে অবোধ বালক! কাহার কাছে যাইতে চাস—মায়ের কাছে? মা যে তোর নাই! বলিষ্ঠ বাহু ও বিশাল বক্ষে আবদ্ধ রহিয়া আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম মেসো-মহাশয়ের মুখের দিকে; চাহিতে চাহিতে মনে পড়িয়া গেল আমার পালক পিতার সেদিনের রোদনের কথা। বিহ্বল হইয়া ভাবিতে লাগিলাম: মা নাই! তবে ব্যথিত প্রাণ-আমার যাঁহার কাছে উড়িয়া যাইবার জন্ম বক্ষ পঞ্জরের পিঞ্জরে পাখা ঝাপটাইতেছে, তিনি আমার কে! আমার জন্ম যিনি বাঁকুড়ার আমি-হারা বাড়ীতে লুটাইয়া কাঁদিতেছেন—আমিই বা তাঁহার কে! আলো-ছায়ার অস্পষ্ট মায়ালোক হইতে বাহির হইয়া মনের পর্দায় ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল মহীয়সী সেই নারী মূর্তি—অতীতের একদা কোন বিস্মৃত প্রদোষ-অন্ধকারে যাঁহার কোলে বসিয়া আমি হাতীর শুঁড়ে হাত বুলাইয়াছিলাম! সে নারীই বা কে

আমার! তিনিই কি আমার সেই মাসীমা—যাঁহার সহিত মেসোমহাশয়ের বিবাহ হইয়াছিল!

সহসা স্টেশনের ঘণ্টায় বাজিয়া উঠিল আমাদের গাড়ীর স্বাগত সম্বর্ধনা। আমি কিন্তু তখন পর্যন্ত মেসোমহাশয়ের বলিষ্ঠ বাহুতে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার বিশাল বক্ষে লগ্ন রহিয়াছি; তখন পর্যন্ত আমাদের চোখে অশ্রুধারার বিরাম নাই। দুইটি ব্যথিত অন্তরের অন্তস্থল হইতে উৎসারিত অশ্রুপ্রবাহ সেদিন সেই স্টেশন-প্লাটফর্মে যে যুক্ত-বেণী রচনা করিল তাহারই তীর্থ-সলিলে সংশয়াচ্ছন্ন আমার শৈশব- চিত্তের প্রথম মুক্তিস্নান!

সাত

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

মেসোমহাশয়ের সহিত মানসিক দিক দিয়া সম্পর্কের একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল বটে, কিন্তু বাচনিক দিক হইতে সম্বোধনের প্রয়োজনীয় রূপান্তর সহসা ঘটিয়া উঠিল না; ফলে পিতাপুত্র উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ বেশ কিছুদিন ধরিয়া চলিতে থাকিল সম্বোধন-হীন নৈর্ব্যক্তিক ভাববাচ্যের সাহায্যে। গত দুই বৎসরের বাঁকুড়া-জীবন আমাকে যথেষ্ট পরিমাণ বন্য করিয়া তুলিয়াছে, কাজেই কুষ্টিয়ার নূতন পরিবেশের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শাসন-নিয়ন্ত্রণ সহজে মানিয়া লইতে সে সম্মত হইল না; তথায় আহারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না বটে, কিন্তু বিহারের যথেচ্ছ স্বাধীনতা সেখানে সম্ভোগ করিয়াছি। বেদুইন বালকের পায়ে ভদ্রজীবন-সুলভ বিধি-নিষেধের নিগড় কতখানি আঁটিয়া বসিল

অথবা বসিল না সে তত্ত্ব ও তথ্য আজ আমার আলোচ্য নয়ঃ জীবনের মরুপথচারা পান্থ আমি—আমারও চলার পথের পাশে পাশে কেমন করিয়া ক্ষণিকের মরুদ্যান জাগিয়া উঠিয়াছে, ক্বচিৎ কোথাও একটি পান্থপাদপ কেমন করিয়া তাহার হৃদয়-নিঙড়ানো স্নেহরস আমার তপ্ত ও তৃষিত অধরে তুলিয়া ধরিয়াছে, কেমন করিয়া তাহার শাখা-প্রশাখা আমার তরু-হীন মরুপথের বুকে তাহার স্নেহ-শীতল ছায়াখানি সাদরে বিছাইয়া দিয়াছে আজ তাহারই মধুর স্মৃতি সমগ্র অন্তর দিয়া স্মরণ করিব, তাহারই পরম প্রীতি সমস্ত হৃদয় দিয়া বরণ করিব।

নিকটতম আত্মীয়ের কাছ হইতে যখন আশা করিয়াছি নিবিড় সহানুভূতিসম্পন্ন অন্তরের আতপ্ত স্পর্শ, অন্তর তখন সাড়া দিয়াছে পৃথিবীর এমন এক অপ্রত্যাশিত কোণ হইতে—যেখানে তাহার ক্ষীণতম অস্তিত্ব পর্যন্ত আমার কল্পনার অতীত। আমি তখন দুরারোগ্য অর্শ-রোগে আক্রান্ত হইয়া অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য বক্সা বন্দী-শিবির হইতে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইয়াছি। অস্ত্রোপচারের জন্য টেবিলে শুইতে যাইব এমন সময় অস্ত্র-চিকিৎসা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার সার্জেন ভাদুড়ী অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত আমার বাড়ীর ঠিকানা ও নিকটতম আত্মীয়ের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্নের হেতু শুধাইলে তিনি অধিকতর সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, ভগবান না করুন, কিন্তু দৈবাৎ যদি অঘটন কিছু ঘটিয়াই যায় তাহা হইলে দুঃসংবাদ তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইবে তো! আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বলিতে কেহ কোথাও নাই; যদি মরিয়া যাই, দয়া করিয়া সে-সংবাদটা গভর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া বলিবেন তাঁহাদের একটা শত্রু নিপাত হইল, আর মৃতদেহটা স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটির হাতে তুলিয়া দিয়া সৎকারের দায়িত্ব তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত

করিবেন। উত্তর শুনিবামাত্র ডাক্তারের মুখ নত হইয়া পড়িল, তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল ঘরের মেঝের উপর : বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, কিন্তু আমরা জানি, আপনি বিবাহিত, আপনার পিতা বর্তমান, তাহা সত্ত্বেও এতবড় একটা মর্মান্তিক নিষ্ঠুর কথা বলিতে আপনার মুখে বাধিল না! পারিবারিক জীবনের প্রতি কি আপনাদের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই?

প্রচুর আকর্ষণ আছে, কিন্তু অবস্থা-গতিকে উপস্থিত তাহা শিকায় তুলিয়া রাখিয়াছি—মাত্র এই কথা কয়টি বলিয়া আমি টেবিলে শয্যা গ্রহণ করিলাম। সুরু হইল ক্লোরোফর্মের বাষ্প-সঞ্চারের পালা: সার্জেন আমাকে সরবে সটকে গুণিতে বলিলেন, কায়ক্লেশে একুশ পর্যন্ত গুণিবার পর বাইশে আসিয়া রথের চাকা থামিয়া গেল; আমি বুঝিতে পারিতেছি, অতঃপর বাইশ বলিতে হইবে, বলিবার জন্য প্রাণ আকুল-বিকুলি করিতেছে, কিন্তু কোনক্রমেই মুখ ফুটিয়া বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি, কানের কাছে কে যেন একজন ডাক্তার দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, বাইশ আর কে গুণিবে, যে গুণিবে সে চলিয়া গিয়াছে! এই লঘু পরিহাসের বিরুদ্ধে আমার সমস্ত সত্ত্বা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, স্পর্ধিত কণ্ঠে সে হুকারিয়া উঠিতে চাহিল বাইশ, প্রমাণ করিতে চাহিল যে, গণনাকারী এখনও চলিয়া যায় নাই, এখনও সে বহাল-তবিয়তে বিরাজ করিতেছে এবং তোমাদের সম্মোহন-বাষ্পের প্রভাব উপেক্ষা করিয়া আরও বহুক্ষণ সে বিরাজ করিবে। বিদ্রোহী-মন একটা আপ্রাণ শেষ চেষ্টার পরিশ্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া অসহায়ভাবে লুটাইয়া পড়িল; কক্ষের বৈদ্যুতিক স্টোভের গর্জন তখনও আমার কানে আসিতেছে: আমি যেন আকাশ-পথের এক নিঃসঙ্গ বিমান-যাত্রী দ্রুতবেগে ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর লোকে উড়িয়া

চলিয়াছি, পদতলে পৃথিবীর কলকোলাহল ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ধীরে ধীরে নিঃশেষে মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল।

সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলে দেখি, দোতলায় আমার নিজের কেবিনে আমি শুইয়া আছি আর ধনবাহাদুর ও রণবাহাদুর নামক যে দুইজন নেপালী পুলিশ আমাকে পাহারা দিবার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারা যথারীতি দরজার দুই পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় সারাদিন ছট্‌ফট করিয়া রাত্রির দিকে জ্বরে আক্রান্ত হইলাম এবং জ্বরের ঘোরে কখন যে অচেতন হইয়া পড়িলাম জানি না। অচেতনে কতক্ষণ যে কাটিয়া গিয়াছে তাহাও হুঁস নাই। জ্ঞান হইলে চোখ মেলিয়া দেখি, একটা নিবিড় সহানুভূতিপূর্ণ মুখ আমার মুখের অত্যন্ত কাছে আসিয়া স্থির হইয়া বিরাজ করিতেছে! দুইটি চোখ গভীর উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া আমার মুখের দিকে একান্তভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। চোখ হইতে ক্লোরোফর্মের ও জ্বরের ঘোর তখনও কাটিয়া ওঠে নাই, কাজেই সমস্ত দৃশ্যটা প্রতীয়মান হইতেছে—একটা স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার মত। কিন্তু দৃশ্য যে স্বপ্নদৃষ্ট নয়, বাঞ্ছিত ও বাস্তব ঘটনা তাহা প্রমাণিত হইতে বিলম্ব হইল না: আমার বুকের উপর বিলম্বিত মুখখানা আরও নিবিড়ভাবে বক্ষঃলগ্ন হইয়া বিস্ফোরিত আর্তনাদে ফুকারিয়া উঠিয়া বলিল, আঁখ খুলো বাবু, আঁখ খুলো! বাত করো বাবু, বাত করো! আকস্মিক সে-আঘাতে অবশিষ্ট ঘোরটুকু অচিরে কাটিয়া গেল; দেখিলাম, সরকারী সিপাই ধন বাহাদুর দুই হাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখ রাখিয়া অঝোরে কাঁদিতেছে! অকৃত্রিম স্নেহের আকস্মিক স্পর্শে আমার কাঙ্গাল হৃদয় তখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, উচ্ছ্বসিত অশ্রুবাষ্প আসিয়া রুধিয়া দাঁড়াইয়াছে আমার কণ্ঠের পথ; শায়িত অবস্থাতেই কম্পিত দুই হাত দিয়া তাহাকে বুকে

চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলাম, ওঠো ধন বাহাদুর, কেঁদো না আর, এই তো আমি সারিয়া উঠিয়াছি, এই তো চোখ মেলিয়া কথা কহিতেছি! পাহাড়ী সান্ত্রীর সুদৃঢ় শরীরখানা ক্রন্দনের রুদ্ধ আবেগে তখনও সঘনে কম্পিত হইতেছে আর সে প্রবল কম্পন-বেগের আঘাতে পঞ্জরের পাষাণ-স্তর শিথিল হইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে উৎসারিত হইয়া আসিতেছে অশ্রুধারারূপে স্নেহের দুইটি স্নিগ্ধ নির্ঝর।

সেদিন সেই গভীর রজনীতে হাসপাতালের রোগশয্যায় শায়িত রহিয়া নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গের সজীব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলাম। তুষার-শীতল স্নেহ-সলিলে অবগাহন করিয়া রোগ-জর্জরিত দেহের সকল জ্বালা মুহূর্তে জুড়াইয়া গেল। বিস্ময়ে হতবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ধনবাহাদুর বৈদেশিক-শাসন-শক্তির একজন বেতনভুক্ সান্ত্রী, আর আমি সেই শক্তিরই চিহ্নিত শত্রু, এ হেন পরস্পর-বিরোধী দুইটি বস্তুর মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তার যোগসূত্র রচিত হইল কেমন করিয়া, রচনা করিলই বা কে! আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও ধনবাহাদুর সে-রাত্রে শয্যা গ্রহণ করিল না, তাহার আশঙ্কা—আবার যদি জ্বর বাড়ে, জ্বরের ঘোরে আবার যদি অচেতন হইয়া পড়ি! সেই ভয়ে রোগীর শিয়রে সে সারারাত্রি বসিয়া রহিল জাগ্রত প্রহরীরূপে। উত্তপ্ত ললাটে ধনবাহাদুরের পরিচর্যারত হস্তের স্নেহ-শীতল-স্পর্শ অনুভব করিতেছি আর স্মরণ করিতেছি, আজই সকালে অস্ত্রোপচারের ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে সার্জেনের সহিত আমার কথোপকথনের ইতিহাস: নিকট আত্মীয় সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে আমি যখন বিশ্বের কোন লোকের সহিত কোনরূপ আত্মীয়তার কথা সরাসরি অস্বীকার করিতেছিলাম, কৌতুক-মুখরা নিয়তি তখন হয়ত অলক্ষ্যে বসিয়া হাসিতে-ছিল আর বলিতেছিল, হায় মূর্খ! আত্মীয়তা কি রক্ত মাংস দিয়া গঠিত

স্থূল বস্তুপিণ্ড যে, ইচ্ছা করিলেই তাহা গ্রহণ অথবা বর্জন করিতে পারে! অতি সূক্ষ্ম অন্তর্গূঢ় এক হৃদয়াবেগ সে, অলক্ষ্য যাহার গতিবিধি, নিঃশব্দ যাহার সঞ্চার—কারাপ্রাচীর তাহার পথরোধ করে না, স্থান ও কালের দূরত্ব তাহার জন্য ব্যবধান রচনা করে না; সকল বাধা চূর্ণ করিয়া, সকল বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া হৃদয় হইতে হৃদয়ে তাহার যুগ-যুগব্যাপী বিজয় অভিযান! আবেগ-উচ্ছ্বসিত বুক হইতে স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে বাহির হইয়া আসিল কবির সেই অমর ভারতী :

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই!"

আট

হিক্‌সের শিক্ষা

জলপাইগুড়ি হাসপাতাল ছোট একটি নদীর ধারে অবস্থিত। প্রত্যহ বিকালে হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়াইয়া শুনি, নদীর ওপারের একটি গৃহ হইতে মাইক-সংযোজিত গ্রামোফোনের গান ভাসিয়া আসিতেছে : 'উজল কাজল দুটি নয়নতারা'; দেখিতে পাই, বহু লোকের যাওয়া-আসাতে সম্মুখের পথ সরগরম, বহু লোকের সমাগমে গৃহের সম্মুখস্থ স্থান জনাকীর্ণ। সন্ধান লইয়া জানিলাম, উহা সিনেমা-হাউস। তখন ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর, তখন পর্যন্ত সবাক্-চিত্র দেখিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার ঘটিয়া উঠে নাই। তৎপূর্বে একটিমাত্র নির্বাক-চিত্র আমি

দেখিয়াছিলাম ; কিন্তু কখন যে সে-ছবির মৌন-কণ্ঠে কথা ফুটিল, হাসি ছুটিল, গান জাগিল ও সুর লাগিল কারা-প্রাচীরের অন্তরালে রহিয়া তাহার আভাস পর্যন্ত এতদিন আমি পাই নাই। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই গৃহের দিকে চাহিয়া থাকিতাম আর ভাবিতাম, অদূরে ওই অন্ধ-যবনিকার অন্তরালে কি জানি কি গভীর রহস্যই না এতক্ষণ ঘনাইয়া উঠিতেছে! একদিন আই, বি, অফিসার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে প্রসঙ্গক্রমে সিনেমা-হাউসের কথা উঠিল, ভদ্রলোক কিন্তু বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলেন না যে, সে-গৃহ আজও আমার নিকট এক অসাম রহস্য-রাজ্য। আমি বলিলাম, বিশ্বাস করুন, আমি আজও সে-রহস্যলোকে প্রবেশ করি নাই ; অবশ্য তাহার জন্য মনে মনে যে কিছুটা অনুতাপ পোষণ না করি তাহা নয়, তবে সে কথা স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করি না নিশ্চয়ই ; বিংশ শতাব্দীর মানুষ এবং সুসভ্য বৃটিশ-সরকারের প্রজা হইয়াও আমি এখন পর্যন্ত টকী দেখি নাই তজ্জন্য লজ্জিত যদি কাহাকেও হইতেই হয় তবে সে লজ্জা আপনাদের সর্বশক্তিমান প্রভু সরকার-বাহাদুরের ; কাজেই বেতনভুক্ বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসাবে সে-লজ্জা হইতে সরকারকে অব্যাহতি দিবার দায়িত্ব আপনার। আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক হইল না, ভদ্রলোক অত্যন্ত তৎপরতার সহিত প্রতিশ্রুতি দিলেন যে পথে বাহির হইবার মত শারীরিক অবস্থা আমার ফিরিয়া আসিলেই তিনি নিজে আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া সিনেমা দেখাইয়া আনিবেন এবং ছবিতে যে কথা কয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শাইয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, সবাক্-চিত্র দেখিবার সাধ আমার সর্বপ্রথম পূর্ণ হয় ১৯৩৭ সালের জুন অথবা জুলাই মাসে : আমি তখন স্বগৃহে অন্তরীন : জলপাইগুড়ি আই, বি, অফিসারের সহিত সিনেমা সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার কথা বন্ধুমহলে গল্প করিলে, তাঁহাদের মধ্যে

একজন বলিলেন, বহরমপুরে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' আসিয়াছে; সিনেমার সহিত প্রথম শুভদৃষ্টি যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে একখানা বইয়ের মত বই লইয়া সুরু করাই ভাল; যদি পারেন বহরমপুরে গিয়া 'দেবদাস' দেখিয়া আসুন। প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিবার উপায় কি! জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অগ্রিম অনুমতি ব্যতিরেকে মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে পা বাড়ান আমার পক্ষে তখন নিষিদ্ধ; কাজেই সিনেমা দেখিবার সুযোগলাভের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের শরণাপন্ন হওয়াই সমীচিন মনে করিলাম। যথাসময়ে প্রার্থিত অনুমতি আসিল এবং তৎসহ অপ্রার্থিত অতিথি হিসাবে আসিলেন দুইজন আই, বি, প্রহরী; দেহরক্ষী-সমভিব্যাহারে রাজকীয় সমারোহের সহিত বহরমপুর গেলাম এবং রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত 'দেবদাস' চিত্র দেখিয়া বিস্ময়মিশ্রিত বিপুল আনন্দ বুকে লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

গোয়েন্দা-কর্মচারীটি তাঁহার প্রতিশ্রুতি শেষপর্যন্ত পালন করিতেন কিনা জানি না, তবে ইতিমধ্যে সংঘটিত এক দৈব দুর্ঘটনা তাঁহাকে সে-প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিল: বক্সা হইতে আর এক-জন রাজবন্দী তখন হার্ণিয়া অপারেশনের জন্য হাসপাতালে আসিয়াছেন; তিনি ইতিপূর্বেও সেই উদ্দেশ্যে আর একবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু সার্জেনের ছুরির মুখে আত্মসমর্পণ করিবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিতে না পারিয়া সেবার তিনি সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করেন। আমি বক্সা হইতে জলপাইগুড়ি চলিয়া আসিবার পর বন্ধুরা আমার ভরসায় এবার তাঁহাকে জলপাইগুড়ি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমন দৈত্যের মত বিশাল ও বলশালী দেহে যে এরূপ শিশুর মত দুর্বল ও ভীরু একটা মন বাস করিতে পারে—বন্ধুবর নীলকৃষ্ণ সাহাকে চাক্ষুষ না দেখিলে তাহা ধারণা করা অসম্ভব। এবারেও তিনি আমার পীড়াপীড়ির ফলে

অস্ত্রোপচার-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু সর্ত-সাপেক্ষরূপে; সর্ত এই যে, আমি স্বয়ং অপারেশন-টেবিলে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিব। সার্জেনকে তাঁহার জিদের কথা জানাইয়া অনুমতি চাহিলে, তিনি সে-প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া মধ্যপন্থা হিসাবে এই পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন যে, ক্লোরোফর্মে অচেতন না হওয়া পর্যন্ত আমি তাঁহার পাশে থাকিতে পারি। তাহাই হইল: বন্ধুটি টেবিলে শুইলে আমি তাঁহার বুকে হাত রাখিয়া পাশে দাঁড়াইলাম; প্রাণপণ জোরে হাতখানা বুকের সহিত চাপিয়া ধরিয়া সম্মোহন-বাষ্প গ্রহণ করিতে লাগিলেন; ধীরে ধীরে হাতের বজ্র-মুঠি শিথিল হইতে হইতে অবশেষে অসহায় লুটাইয়া পড়িল শয্যাপ্রান্তে। আমি যেমন স্ট্রেচারে বাহিত হইয়া নীচের তলায় আসিয়াছিলাম, স্ট্রেচারে শায়িত হইয়াই তেমনি ফিরিয়া গেলাম নিজের কেবিনে।

অস্ত্রোপচারের দ্বিতীয় দিনে আমি সবেমাত্র মধ্যাহ্ন আহার শেষ করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় দেখি জলপাইগুড়ির তদানীন্তন পুলিশ-সুপার পাগলা হিক্স সাহেব পুলিশ ও ডাক্তারগণ পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রুতপদে দোতলায় উঠিতেছেন। ডাক্তারের নিকট হইতে আমার রোগ-বিবরণ শুনিবার পর তিনি সদলবলে গিয়া প্রবেশ করিলেন নীলকৃষ্ণ সাহার ঘরে, আমিও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। সাহেব সোজা রোগীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং অঙ্গভঙ্গী সহকারে যে নীতি এবং ভীতিমূলক ভাষণ দিতে লাগিলেন, সরল বাংলা ভাষায় তাহার অনুবাদ করিলে মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, সেবার তুমি পালাইয়াছিলে কিন্তু এবার পালাইলে তোমার সম্বন্ধে বিহিত-ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। নীলকৃষ্ণ অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে অর্ধ-চেতন ও অর্ধ-অচেতন অবস্থায় শুইয়া সে-ভাষণ শুনিতে লাগিল, তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হইল,

সাহেবের একটি কথাও সম্ভবতঃ তাহার কাণের পথ দিয়া প্রাণে পৌছাইতেছে না। রোগীর উপরে পুলিশী-পীড়ন নীরবে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া আমি বলিলাম, সাহেব, রোগীর অস্ত্রোপচার কার্য পূর্বেই সমাধা হইয়া গিয়াছে, কাজেই অকারণ নাকের ডগায় আঙ্গুল নাড়িয়া নৈতিক বক্তৃতা দিবার অবকাশ নাই ; রোগে সান্ত্বনা না দিতে পার, অন্ততপক্ষে শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটাইও না। একে সাহেব চটিলেই বিপদ, তাহার উপর পাগলা সাহেব দস্তুরমত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে ; সরোষে অগ্রসর হইয়া সাহেব আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, কোন্ অধিকারে তুমি আমার কাজে বাধা দিতে সাহস কর ?

অধিকারের কথা শুনিয়া আমি আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলাম না, আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে বলিলাম, অধিকারের প্রশ্ন করিতেছ সাহেব, তবে শোন অধিকারের কথা ঃ পীড়িত মনুষ্যত্বের প্রতি মানুষের সহজাত সমবেদনার অধিকার, একই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকরূপে সহকর্মীর প্রতি সহকর্মীর প্রীতির অধিকার, একই নির্যাতনে নিপীড়িত কর্মীরূপে বন্দীর প্রতি বন্দীর সহজ ও স্বাভাবিক স্নেহের অধিকার। অধিকারের তালিকা আর বাড়াইব না, এখন জানিতে পারি কি সাহেব কোন্ অধিকারবলে রোগ-যন্ত্রণা কাতর একটা মানুষের উপর এমন অমানুষিক অত্যাচার করিবার স্পর্ধা তুমি রাখ ? আমার ধারণা ছিল, তুমি রাজবন্দিদের কুশল সংবাদ লইবার জন্য এখানে আসিয়াছ ; যদি জানিতাম, তাহাদের সদ্য-অস্ত্রোপচারজনিত ক্ষতে লবণ নিক্ষেপই তোমার আগমনের উদ্দেশ্য তাহা হইলে ডাক্তার সাহেবকে বলিতাম, তিনি যেন রোগীর কেবিনে তোমাকে প্রবেশ করিতে না দেন। সিভিল সার্জেন ডাক্তার ইয়ং সম্মুখেই দণ্ডায়মান ছিলেন ; দুইটি লাল মুখ পরস্পরের দিকে চাহিয়া লজ্জায় অথবা রোষে জানি না, অধিকতর রক্তিম হইয়া উঠিল। পাগলা হিক্‌স সাহেব ব্যর্থ আক্রোশে

রুষিয়া-ফুঁসিয়া এই বলিয়া আমাকে শাসাইয়া চলিয়া গেলেন যে, অচিরে আমাকে রীতিমত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

সাধ্যমত একটা শিক্ষা পাঠাইতে হিক্স সাহেবের বিলম্ব হইল না: ঘটনার দ্বিতীয় দিনে বিকালবেলায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি, গোয়েন্দা-বিভাগের মেজবাবু হাতে একখানা কাগজ দোলাইতে দোলাইতে উপরে উঠিয়া বলিলেন, একঘণ্টার মধ্যে প্যাসেঞ্জার-ট্রেনে আপনাকে বক্সা রওয়ানা হইতে হইবে। বদলির হুকুমনামাখানা হাতে দিয়া তিনি আমার জবাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; পাঠ করিবার পর আমি তাহা তাঁহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, আপনাদের সাহেবকে বলিবেন, মাথার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া যাওয়ার দরুণ অতিরিক্ত উত্তেজনার বশে তিনি নিজের অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন: আমি পুলিশ-ক্লাবের অতিথি নই, হাসপাতালের রোগী; কাজেই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ যতক্ষণ না আমাকে জবাব দিতেছেন, আপনাদের সাহেব-প্রভু যত বড় শক্তিমানই হোন না কেন—তাঁহার সাধ্য নাই যে এখানে আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করেন। গোয়েন্দা-কর্মচারী ব্যাপারটা অনুধাবন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, আদেশপত্রে একটা দারুণ নিয়মতান্ত্রিক ত্রুটি হইয়া গিয়াছে। তিনি নিঃশব্দে সদলবলে বিদায় লইলেন এবং ত্রুটি সংশোধন করাইয়া লইয়া রাত্রি আটটার সময় আবার আসিয়া হাজির হইলেন—দার্জিলিং-মেলে আমাকে লইয়া যাত্রা করিবার জন্য।

বুঝিলাম সার্জেন ভাদুড়ীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া হাসপাতাল হইতে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে ডিস্‌চার্জ করাইবার ব্যবস্থা করা হিক্স সাহেবের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে; তিনি থাকিলে পুলিশী-প্রভাব এক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি করিয়াই পরাভব মানিয়া লইতে বাধ্য হইত—ইতিপূর্বে অন্য আর-এক ক্ষেত্রে যেমন সে হইয়াছিল: সেক্ষেত্রে

লাটসাহেব আসিতেছেন—হাসপাতালের নূতন অপারেশন-থিয়েটারের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিবার জন্য। অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রটি ঠিক আমার কেবিনের নিম্নেই অবস্থিত। গভর্ণরের আগমনের দুইদিন পূর্বে প্রাতঃকালে আমার কক্ষে স্ট্রেচার আসিয়া হাজির, এই মুহূর্তে হাসপাতালে অন্য প্রান্তে আমাকে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। হেতুটা সঠিক অনুধাবন করিতে না পারিলেও স্ট্রেচারে গা ঢালিয়া দিব—এমন সময় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সার্জেন ভাদুড়ী তথায় আসিয়া হাজির; মন্দের ভালো মন্দের ভালো বলিতে বলিতে তিনি সর্বনাশ সমুৎপন্ন দেখিয়া অর্ধেক ত্যাগ করিবার চাণক্য-নীতি স্বগতকণ্ঠে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সবে মিলিয়া ব্যাপারটা আমার কাছে জটিলতর হেঁয়ালী হইয়া উঠিল; নূতন ঘরে নীত হইবার পর সার্জেন ভাদুড়ী সে-হেঁয়ালীর যে সমাধান দিলেন তাহা এইরূপ: লাটসাহেবের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গোয়েন্দা-বিভাগ হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্মে এক প্রস্তাব প্রেরণ করেন যে, অন্ততঃপক্ষে এক পক্ষ কালের জন্য আমাকে হাসপাতাল হইতে জলপাইগুড়ি জেলে প্রেরণ করা প্রয়োজন। ডাক্তার সাহেবের অবশ্য সে বিষয়ে অসম্মতির লেশমাত্র ছিল না, কিন্তু গোয়েন্দা-বিভাগীয় ফন্দী ফাঁস করিয়া দিলেন সার্জেন ভাদুড়ী: তিনি বলিলেন, ডাক্তার হিসাবে তিনি মনে করেন, স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় রোগী স্থানান্তরের সম্পূর্ণ অযোগ্য; তৎসত্ত্বেও পুলিশ কর্তৃপক্ষ যদি স্থির করেন, তাঁহাকে জেলে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন—তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা করিতে পারেন; তবে তৎসহ তাঁহাদিগকে আর একটি কাজও করিতে হইবে: রোগীর বাঁচা-মরার দায়িত্ব যে তাঁহাদের—এ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট অঙ্গীকারপত্র তাহাদিগকে লিখিয়া দিতে হইবে। সে-দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সাহসী হইলেন না, কাজেই বিকল্প প্রস্তাব

হিসাবে আমাকে অন্ত কক্ষে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা তাঁহাদিগকে মানিয়া লইতে হইল। এক্ষেত্রেও সার্জেন ভাদুড়ী উপস্থিত থাকিলে তাঁহার সবল ও সহানুভূতিপরবশ হস্তক্ষেপে প্রতিহত হইয়া হিক্সের প্রতিহিংসা যে ব্যর্থ হইত তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। কিন্তু তাহা হইবার নয়, তিনি সেদিন দার্জিলিং-এ অবস্থান করিতেছেন এবং হিক্স সাহেব সেই সুযোগটিকেই আমাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার প্রশস্ততম-ক্ষণরূপে বাছিয়া লইয়াছেন।

এদিকে যাত্রার ক্ষণ আসন্ন। গোয়েন্দা-কর্মচারিকে আমি বলিলাম, মহাশয়, একটু অপেক্ষা করুন, আমার রোগী-বন্ধুদের নিকট হইতে একটু বিদায় লইয়া আসি। একের পর এক প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকটি শয্যার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম, যাঁহারা নিদ্রিত, তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গাইলাম না, যাঁহারা জাগিয়া ছিলেন, পুলিশসহ এমন অসময়ে আমাকে ওয়ার্ডে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন, তাঁহাদের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল কৌতূহলী কত না প্রশ্ন। যতদিন হাসপাতালে ছিলাম, রোজ তিনবেলা তাঁহাদের ওয়ার্ডে গিয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিজনার তত্ত্ব-তল্লাস লইয়াছি এবং সাধ্যমত সেবা ও সান্ত্বনা পরিবেশন করিয়াছি; এমন অসময়ে এরূপ প্রহরী-পরিবেষ্টিত অবস্থায় আমাকে দেখিবার জন্য তাঁহারা আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। আমি আমার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বিদায় চাহিলাম; কেহ বা অপ্রত্যাশিত বিদায়বার্তা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া সংশয়-ভরা অপলক চোখে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কেহ বা সস্নেহে আমার করধারণ করিয়া সাদরে তাহা স্থাপন করিলেন আপন উত্তপ্ত ললাটের উপর; কেহ হাত বাড়াইলেন পায়ের ধূলো লইবার জন্য, কেহ বা হস্ত প্রসারণ করিলেন মাথায় কল্যাণ-আশীর্বাদ স্থাপনের নিমিত্ত;

সবারই চোখে জল! বলাবাহুল্য, আমারও চোখ শুষ্ক ছিল না। গোয়েন্দা-কর্মচারী স্মরণ করাইয়া দিলেন, সময় সংক্ষেপ, আর কাল-বিলম্ব করা চলে না। হাসপাতালের সীমা পার হইবার পূর্বেই আর সব মুখ ম্লান করিয়া মনের পটে জাগিয়া উঠিল আর একটি মুখের ছবি, সারাটি বুক মথিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস-মুখে বাহির হইয়া আসিল আর একটি নাম: ধনবাহাদুর! ধনবাহাদুর এখন কোথায়! যাইবার পূর্বে তাহার নিকট বিদায় লইতে না পারার ব্যথা বুকে বিদ্ধ হইতে লাগিল সুতীক্ষ্ণ কণ্টকের মত। রাজবন্দীর মত যথাযোগ্য মনোভাব পোষণ না করিবার অপরাধে বহুপূর্বে সে আমার প্রহরা হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে।

অত্যন্ত দুর্বল দেহ লইয়া নভেম্বরের শীতার্ত রাত্রিতে হাসপাতালে রোগ-শয্যা হইতে পথে বাহির হইতে হইল—মিঃ হিক্‌স হয়তো ইহাকেই সমুচিত শিক্ষা মনে করিয়া মনে মনে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু হায় হিক্‌স সাহেব! তুমিত জাননা—তোমার এবং তোমার গোয়েন্দা-বিভাগের শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইয়া কী দুর্লভ বস্তু আমি হাসপাতাল হইতে আহরণ করিয়া লইয়া চলিলাম! সরকারী-সান্ত্রী ধনবাহাদুরের সস্নেহ সেবা পরিচর্যা, আমার জন্য তাহার উদ্বিগ্ন রাত্রিজাগরণ, আমার জন্য তাহার উৎসারিত অশ্রুধারা, আসন্ন বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় রোগীদের চোখের বেদনার্ত-দৃষ্টি, বিদায়-সম্বর্ধনারূপে তাহাদের রোগশীর্ণ কম্পিত হস্তের আতপ্ত স্নেহস্পর্শ—ইহাই আমার সারা জীবনের স্মৃতির সঞ্চয়, দীর্ঘ কারা-জীবনের ইহাই আমার প্রীতির পাথেয়!

নয়

বক্সা বন্দী-শিবির

এত শীঘ্র বক্সা প্রসঙ্গে আসিয়া পৌঁছাইবার ইচ্ছা ছিল না। ধনবাহাদুরের স্মৃতির স্বর্ণসূত্র প্রীতির আকর্ষণে নিতান্ত অসময়ে আমাকে সেখানে টানিয়া আনিল এবং আনিবার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা ক্ষেত্রে ঘটিয়া গেল একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন; প্রেমের ঠাকুরের হৃদয়-দেউল রূপান্তরিত হইল সুন্দরের শ্রীমন্দিরে, প্রীতির পুণ্যতীর্থ রূপপরিগ্রহ করিল লাবণ্যের লীলা-নিকেতনের।

কৃষ্ণনগর জেল হইতে বক্সা-বন্দীশালায় বদ্‌লি হইয়া চলিয়াছি। সঙ্গে আরও তিনজনের মধ্যে আছেন ময়মনসিং-এর দক্ষিণাদা' ওরফে দাদু। আমি ধৃত হইবার কিছুদিন পূর্বে আমাদের জেলার জনৈক গোয়েন্দা-কর্মচারি আমাকে বলিলেন, আপনাদের মহারাজ প্রভৃতিকে বক্সায় রাখিয়া আসিলাম, চমৎকার যায়গা, অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, আপনার মত কবি মানুষের বসবাসের যোগ্য স্থান। তাঁহার নিকট হইতে রূপের বর্ণনা শুনিয়া না দেখিয়াই বক্সাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম; দাদুর নিকট হইতে বিস্তৃততর বিবরণ শুনিয়া পূর্বরাগ প্রবলতর হইল; বক্‌সায় উপনীত হইবার ঐকান্তিক আগ্রহের দরুণ পথ মনে হইতে লাগিল অসীম, কাল অনন্ত। কুচবিহার পার হইয়া কোন এক স্থানে দাদু সহসা ট্রেনের জানলার বাহিরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওই দেখুন, পাহাড়ের গায়ে বক্‌সা দেখা যায়! তাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেত অনুসরণ করিয়া সম্মুখে চাহিতেই দেখি, পাহাড়ের মাথার উপর যেন একটি তুলসীমঞ্চ স্থাপিত রহিয়াছে। বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইলনা যে, অতি

ক্ষুদ্র ওই মঞ্চটি শত শত রাজবন্দীর আবাসস্থান! আমার সন্দিগ্ধ প্রশ্নের জবাবে দাদু বলিলেন, উহা ক্যাম্প নয়, ক্যাম্প উহার কিছুটা নিম্নে অবস্থিত; তুলসী-মঞ্চের মত প্রতীয়মান বস্তুটি সান্ত্রীদের প্রহরামঞ্চ; বস্তুত উহা দৈত্যের মত দীর্ঘাকৃতি, তৎসত্ত্বেও উহা খর্বাকার বামন-মূর্তির মত দেখাইতেছে—সে শুধু পার্বত্য-মায়ার ইন্দ্রজাল প্রভাবে।

প্রথম শুভ-দৃষ্টির ক্ষণে অবাধ পাহাড় হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলাম না: এই মুহূর্তে রৌদ্রে ঝলমল করিয়া উঠিতেছে, পর মুহূর্তেই গলিত শীসার মত লঘু স্বচ্ছ পীতাভ বাষ্প যবনিকার মত অন্তরালে তাহা আড়াল হইয়া যাইতেছে; আলো ও ছায়ার মায়া-নাচের আসর যেখানে পাতা হইয়াছে—মন উধাও হইয়া উড়িয়া চলিয়াছে সেই রহস্য-লোকের উদ্দেশে। যতই অগ্রসর হইতেছি, লাইনের দুই ধারের শালবন ঘনতর হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে পাহাড়ের পদমূল স্পর্শ করিবার জন্য। দীর্ঘ উৎকণ্ঠার অবসানে স্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলাম; শুনিলাম চড়াই-উৎরাইয়ের নাগরদোলায় দোল খাইয়া ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর বন্দী-শিবিরের সাক্ষাৎ মিলিবে। জানি, একবার সেখানে প্রবেশ করিলে নির্গমনের পথ সহজে ও শীঘ্র খুঁজিয়া পাইব না, তথাপি বন্দী-শালা দূর হইতে বিরাটকায় অজগরের মত নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আমাকে নিকটে আকর্ষণ করিতেছে; আমার দেহের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরায় সে টান আমি যতই নিবিড়ভাবে অনুভব করিতেছি, বক্সার জন্য বাসনা-ব্যাকুল মন আমার ততই অধীর ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে।

অবশেষে স্টেশন পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা যাত্রা সুরু করিলাম; কিছুদূর যাইতে না যাইতেই সমগ্র বনভূমি আলোড়িত করিয়া নামিয়া আসিল প্রবল বর্ষণ। তখন জুন মাস, বাংলার বুকে বাদল সাড়ম্বরে না নামিলেও, গিরিরাজ প্রাসাদের গানের আসর দেখিলাম তাহার মেঘমল্লার

সুরে সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। বিস্ময়ে বর্ষার রাজকীয় সমারোহ প্রত্যক্ষ করিতেছি, এমন সময়ে কোথা হইতে কানে আসিল সমুদ্র-কল্লোলের মত গভীর গর্জন। শুনিলাম, পথের অদূর দিয়া ঝর্ণা প্রবাহিত। ঝর্ণা! দুইটি মাত্র অক্ষরবিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত সেই শব্দটি শুনিবামাত্র প্রাণ নাচিয়া উঠিল নির্ঝরের নৃত্যছন্দে: ভুলিয়া গেলাম যে, পরিণত-প্রায় যৌবনে এমন তারুণ্য-তাড়িত-চাঞ্চল্য শোভা পায় না; স্বচ্ছন্দ বিচরণের অধিকারবর্জিত সান্ত্রী-পরিবেষ্টিত আমি যে রাজবন্দী সে কথাও আমি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলাম; কৌতূহলী বালকের মত আমি যেই ছুটিলাম গর্জন লক্ষ্য করিয়া, সশস্ত্র প্রহরীদল সম্ভবত আসামীর পলায়ন আশঙ্কা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সচল হইল আমার অনুসরণে। অপ্রস্তুত হইয়া আমি বলিলাম, ভয় নাই, পালাইব না—অন্তত ঝর্ণা দেখিবার পূর্বে তো নয়ই। প্রহরীদের বধির কর্ণে প্রতিহত হইয়া আমার পবিত্র প্রতিশ্রুতি পার্বত্য বনভূমিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল, সুতরাং তাহাদের ও আমার মধ্যে যে ব্যবধান এতক্ষণ বিদ্যমান ছিল তাহার কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিল না।

প্রথম সিনেমা দেখার মত প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়াই প্রথম ঝর্ণা দেখিলাম; কিন্তু একী অপূর্ব রূপ ঝর্ণার! কোথায় তাহার 'গৈরিকবর্ণ ভৈরবী বেশ!' এ যে বিগলিত স্ফটিক-প্রবাহ প্রখর তরঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া লীলায়িত নৃত্যছন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে উপলমুখরিত সানুদেশ দিয়া! আবার আমাদের যাত্রা সুরু হইল: মাথার উপরে বাদল মেঘের অশ্রান্ত বর্ষণ, বনভূমি কম্পিত করিয়া বর্ষা-সঙ্গীত নির্ঝরের নৃত্য-মহোৎসব, তাহারই সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শিহরিত অরণ্যের পত্র-পল্লবে বাজিয়া উঠিয়াছে বাদল-বন্দনার গীতি-গুঞ্জন। অরণ্যের ঐক্যতানমঞ্চের বিচিত্র সঙ্গীতঝঙ্কার শুনিতে শুনিতে পর্বতের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে একটি সশস্ত্র পুলিশঘাঁটি অবস্থিত রহিয়া শিবিরের প্রধান প্রবেশ-

পথ রক্ষা করিতেছে। পার্বত্যপথ সেখান হইতে যেমন পাকে পাকে জড়াইয়া উঠিয়াছে, আমরাও তেমনি তাহার বাঁকে বাঁকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতরলোকে উঠিতে লাগিলাম ; চলার পথে ঝর্ণা কোথায়ও ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে শিলা হইতে শিলাখণ্ডের উপর, আবার কোথাও বা তাহার অলক্ষ্য সত্বা গর্জন করিতেছে অন্ধকার কোন গিরি-কন্দরের অতলস্পর্শী অভ্যন্তরে। দুর্গম পার্বত্য-পথ আরোহণের ক্লান্তি অথবা অবসাদ এতক্ষণ অনুভব পর্যন্ত করিতে পারি নাই, পার্বত্য-প্রকৃতির সৌন্দর্য-সমারোহে মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া ছিল যে, তাহা অনুভব করিবার অবকাশ সে পায় নাই। কিন্তু বন্দী-শিবিরের দৃশ্য যখন দৃষ্টিগোচর হইয়া জানাইয়া দিল যে, দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আমরা চলার পথের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছাইয়াছি ; অদূরে বন্দীশালার অচলায়তন অতিথিদের জন্য দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, অতিথিরা প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে দ্বার রুদ্ধ হইবে আবার তাহা কবে অবারিত হইবে কে জানে, দেহ এবং মন তখন অবসন্ন হইল কিনা জানিনা শুধু এতটুকু মাত্র জানি যে, সমগ্র হৃদয় ব্যাপিয়া ও জীবন ছাপিয়া বহির্জগতের জন্য জাগিয়া উঠিল এক গভীর মমত্ববোধ ও নিবিড় আত্মীয়তার চেতনা। শিবিরে প্রবেশের পূর্বে তাই বাহিরের দুনিয়াটাকে শেষবারের মত দুই চোখ ভরিয়া দেখিয়া লইলাম, স্বাধীন জগতের মুক্ত বায়ু শেষবারের মত বুক ভরিয়া টানিয়া লইলাম, সঙ্গে এই সান্ত্বনামাত্র সম্বল রহিল যে, বন্দী-শিবিরে থাকিব আমি আর সম্মুখে থাকিবে ওই পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে থাকিবে ঘনশ্যাম গভীর অরণ্য ও তাহারই রহস্য-রাজ্যে থাকিবে মেঘ-রৌদ্র, আলো-ছায়া ও কিরণ-কুহেলীর পর্যায়-ক্রমিক আনাগোনা ! সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া বৈচিত্র্যহীন বন্দী-জীবনের দিনগুলির মন্দীভূত গতিবেগে নির্ঝরের নৃত্যছন্দের দোল লাগিবে, পার্বত্য-

প্রকৃতি তাহার নিপুণ তুলিকা দিয়া আমার দীর্ঘমেয়াদী-কারাজীবনের রূঢ় ও কর্কশ পথের বুকে আঁকিয়া দিবে আপনার লাবণ্যের বিচিত্র আলিম্পন।

পার্বত্য-প্রকৃতি সে আশায় আমাকে দিনেকের জন্যও বঞ্চিত করে নাই, আশাতীত দাক্ষিণ্যের অপর্যাপ্ত দানে সে আমার ভিক্ষার ভাণ্ড কাণায় কাণায় ভরিয়া দিয়াছে; উপচিয়া-পড়া আনন্দের উদ্বৃত্ত অংশটুকু আমি বন্ধুমহলে পরিবেশন করিয়াছি নিত্য নব কবিতার বিচিত্র ছন্দে। বক্সা-শিবিরের চতুর্দিকের দৃশ্য আজও অনপনেয় রেখায় ও রং-এ আমার অন্তরের পটে অঙ্কিত রহিয়াছে; বক্সার বর্ষার যে প্রবল আবেগ, বক্সার জ্যোৎস্নায় যে গভীর আবেশ, বক্সার অন্ধকারে যে নিবিড় নিঃসীমতা, বক্সার অরণ্যে যে স্নিগ্ধ শ্যামলিমা—একান্তভাবে তাহা শুধু বক্সারই। অতি প্রত্যূষে শিবিরের এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইতাম সূর্যোদয় দেখিবার জন্য; সে এক অপূর্ব দৃশ্য! সমস্ত শিবিরখানা তখনও উদয়পূর্বকালীন তরল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, দুর্গা প্রতিমার চালীর মত পূর্বদিকের পাহাড়টার পানে নির্নিমেষ চাহিয়া রহিতাম; সূর্য যেমন পাহাড়ের পিঠ বাহিয়া হামাগুড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে, আলোক-ছটা বিক্ষিপ্ত হইয়া ঠিকরিয়া পড়িতেছে দুই পার্শ্বে ও চূড়ার অগ্রভাগে। সূর্য যেই শীর্ষস্থানে আরোহণ করিল, ঈষদন্ধকার শিবিরখানা সেই মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল প্রথম অরুণোদয়ের আলোক-সম্পাতে। শুক্লপক্ষের বর্ষা ও শরৎ-সন্ধ্যায় সেই লীলারই পুনরাভিনয় প্রত্যক্ষ করিতাম। দক্ষিণ দিকের অনুচ্চ পাহাড়টির মাথার উপর দিয়া দেখিতাম, যে-বিশাল ভূখণ্ড অর্ধবৃত্তাকারে শিবিরটাকে বেষ্টন করিয়া আস্তৃত রহিয়াছে পাহাড়ের পশ্চাতে উদিত চন্দ্রের আলোক-সম্পাতে তাহা প্রোজ্জ্বল, বন্দী-শিবিরের উপর অন্ধকার কিন্তু তখনও অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজত্ব

করিতেছে। চাঁদ তখন চূড়ার নিকটবর্তি, তাহার আলোর ঝিলিক ততই ঝলকিয়া উঠিতেছে পর্বত-চূড়ার কিনারে কিনারে; অবশেষে গিরি-শিখরের চূড়াগ্রে যেই জাগিয়া উঠিত উদীয়মান চন্দ্রের বৃত্তাংশ, সমস্ত শিবিরখানা অমনি জোছনার জোয়ারে প্লাবিত হইয়া ধারণ করিত এমন এক অপরূপ রমণীয় মূর্তি—যাহার দিকে চাহিয়া মনে হইত, ইহা যেন অচেনা, অদৃষ্টপূর্ব এক রহস্য-প্রতিমা।

এ'দিকে পূবের পাহাড়ের রূপমঞ্চেও যখন চলিত লাবণ্য-লহরীর এই নিত্য লীলাভিনয়, পশ্চিমের পাহাড়ের পাদমূলে তখন পাতা হইত সুন্দরের অর্চনার জন্য কারুকার্যখচিত এক অপূর্ব আসন; প্রতিদিন অপরাহ্নে সে-লীলা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আসন গ্রহণ করিতাম শিবিরের পশ্চিম-প্রান্তস্থ এক শিলাখণ্ডে: পশ্চিমের কুয়াশাচ্ছন্ন সমগ্র সমতলভূমি প্রতীয়মান হইত এক বিস্তীর্ণ সাগরের মত আর তাহারই উপর স্তরে স্তরে সজ্জিত মেঘদল দেখিয়া মনে হইত—সাগর-তরঙ্গরাজি যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে সূর্য আসিয়া অবগাহনের জন্য যেই নামিত সেই সাগরজলে, অমনি শুদ্ধ তরঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে জাগিয়া উঠিত চঞ্চল জীবন-স্পন্দন, ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ-সমারোহে সে-আনন্দ চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িত। উপরিভাগে প্রবল কম্পন রাখিয়া ধীরে ধীরে সূর্য ডুবিয়া যাইত সাগর-জলে: শান্তসায়রের বুকে শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে উদ্ভূত-চাঞ্চল্য যেমন বৃত্তাকারে সায়রের সারা বুকখানি ছাইয়া ফেলে, বাষ্প-সমুদ্রের উপরিভাগের কম্পনবেগও তেমনি ক্রমবর্ধমান বৃত্তের আকারে সমগ্র বাষ্পীয় সমুদ্র সমাচ্ছন্ন করিত। তাহার পর আবার সব নিস্পন্দ নিথর; চাহিয়া দেখি, সন্ধ্যার ধূপ-ছায়া-রঙের শাড়ীর ধূসর আঁচলখানি শ্লথ হইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে—অরণ্যশীর্ষে, শৈলশিখরে, উপত্যকার উপরে ও বন্দী-শিবিরের বুকে। বস্ত্রাঞ্চল আশ্রয় করিয়া কখন যে

গভীর কুয়াশা নামিয়া আসিতেছে বুঝিতে পারি নাই, চাহিয়া দেখি—তাহারই অন্ধ-যবনিকা বিশ্বসংসারকে অন্তরাল করিয়া দৃষ্টির সম্মুখে দোদুল্যমান। অচিরে অন্ধকারের বুক চিরিয়া নামিয়া আসিত প্রবল বর্ষণ : চতুর্দিকের পর্বতগাত্রে আহত হইয়া মেঘগর্জন শিবিরের চারিধারে গুমরিয়া ফিরিত, বর্ষাস্ফীত নির্ঝরগুলির জলতরঙ্গে বাজিয়া উঠিত ভৈরবের ভয়াল রাগ, তাহারই মাঝে মাঝে সান্ত্রীদের নিক্ষিপ্ত হাওয়াই মেঘও কুহেলীর কৃষ্ণ-যবনিকা ছিন্ন করিয়া ছুটিয়া চলিত আকাশ-পথে। প্রহরে প্রহরে পার্বত্য-প্রকৃতির নব নব রূপায়ন, পলকে পলকে রূপ-মঞ্চের দৃশ্যপট পরিবর্তন—সুন্দরের এই অনন্ত অভিসার যেখানে নিত্য লীলায়িত—কারাগার রচনার কল্পনা সেখানে সাগরের বুকে মরুভূমি সৃষ্টির চেষ্টার মতই হাস্যকর। প্রাণের পরশ সেখানে ছিল না বলিয়াই রূপের প্লাবন তথায় নামিয়া আসিয়াছিল বিশ্বপ্লাবী বন্যায়। জীবনের মরুপথচারী পান্থ আমি, চলার পথের বাঁকে বাঁকে কখনও প্রেম আসিয়া প্রাণে যদি তাহার পরশমণি না ছোঁয়াইত কখনও বা রূপ আসিয়া চোখে তাহার রঙ্গিন তুলি না বুলাইত, তাহা হইলে জীবনের দীর্ঘ ও দগ্ধ মরুপথ পার হইয়া আসিতাম কোন্ শান্তি ও সান্ত্বনা সম্বল করিয়া : রূপ এবং প্রেম পর্যায়ক্রমে আমার প্রাণের তন্ত্রীতে বাজাইয়া চলিয়াছে নূতন আশার আসোয়ারী সুর, নবীন ভরসার ভাটিয়ালী গান।

দশ

বন্দী-শিবিরে হেঁসেল ভাগ

বহির্জগতে যখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই বিপুল সমারোহ, শিবরের অভ্যন্তরে বন্দীদের মনোজগতে তখন চলিয়াছে মার্কসীয় মতবাদের প্রচণ্ড মন্থন। একেই ১৯৩০ সালের আইন-অমান্য-আন্দোলনের ফলে বাংলার জেলাগুলি সত্যাগ্রহী বন্দীদের দ্বারা কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে; তাহার উপর বেঙ্গল অর্ডিনান্স ও পরে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের কল্যাণে বিভিন্ন বিপ্লবীদলীয় বন্দিগণ বিপুল সংখ্যায় আসিয়া পরিপূর্ণ জেলগুলি প্রায় উপচিয়া তুলিলেন। বিপ্লবী নেতাগণ যখন সত্যাগ্রহী বন্দীমহলে ঢুকিয়া তাহাদের মধ্য হইতে মনোমত শিকার সন্ধানে ব্যস্ত, কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ তখন একদিকে যেমন সে ক্ষেত্রে বিপ্লবী নেতাদের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলেন, অপরদিকে তেমনি আবার খাস বিপ্লবীদলগুলির মধ্য হইতে সদস্য সংগ্রহের জন্য দলীয় দুর্গের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করিলেন। অসম সে প্রতিযোগিতায় বিপ্লবীদলগুলি পদে পদে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইল প্রধানত দুইটি কারণে: প্রথম, যৌবনের হৃদয়াবেগের নিকট আবেদন জানানো ছাড়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের চিন্তার খোরাক যোগাইবার মত তাহাদের কোন রাজনৈতিক দর্শন ছিল না; দ্বিতীয়, কমিউনিস্ট মতবাদের দ্বারা প্রত্যেকটি বিপ্লবীদল যদিও আক্রান্ত তৎসত্ত্বেও সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়া তাহারা পারস্পরিক আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে নিযুক্ত রহিল। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য সত্যাগ্রহী বন্দিদিগকে বৈপ্লবিক মতবাদের বিপজ্জনক সংক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদলীয় বন্দীদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দীশালা খুলিয়া

বসিলেন, কিন্তু বিপ্লবীদলগুলির পক্ষে তাহার আশু কুফল হইল এই যে, পারস্পরিক যে-বিদ্বেষ ও সংশয় তাহাদের অস্থি-মজ্জাগত তাহারই বশে দল-অনুযায়ী তাহারা বিভিন্ন কীচেনে বিভক্ত হইয়া গেল, ফলে কীচেন-সঙ্ঘের তালিকা দেখিয়া গোয়েন্দা-বিভাগের পক্ষে চালাই করিয়া নির্ভুলভাবে বাছিয়া বাহির করা কষ্টসাধ্য হইল না, কে কোন্ দলভুক্ত।

এদিকে কমিউনিস্ট-প্ররোচনা ও প্রচার-কার্যের ফলে বিপ্লবী-দলগুলির মধ্যে ইতিপূর্বেই যে ফাটল সৃষ্টি হইয়াছিল, কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের দরুণ তাহার প্রসার দিনে দিনে বর্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ধ্বস নামিল আন্দামানে; প্রায় ছয় শত বিপ্লবী বন্দিদের মধ্যে মাত্র যে-কয়জন সে-ভাঙনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন—অঙ্গুলিপর্বে তাঁহাদের সংখ্যা গণনা করা যায়। সে ধ্বংসের ধাক্কা বাংলার জেলাগুলির প্রাচীরে আসিয়া আহত হইতে বিলম্ব হইল না। বিপ্লব-দলগুলি দীর্ঘ দিনের শ্রমে ও সাধনায় তাহাদের সদস্যদের মধ্যে যে শাসন-সংযম ও নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল, কমিউনিজমের তথাকথিত বৈপ্লবিক মতবাদ আসিয়া তাহার বন্ধন-রজ্জু একেবারে ছিন্ন করিয়া দিল, নৈতিক বন্ধন হইতে সদ্য-বিমুক্ত সে-স্বাধীনতার মাদক-মোহে তরুণ-চিত্তগুলি আকৃষ্ট না হইয়া পারিল না; কিন্তু তাই বলিয়া মার্ক্সীয় মতবাদের প্রতি আদর্শগতনিষ্ঠা যে আদৌ কোন ক্ষেত্রে ছিল না—ইহা আমার বক্তব্য নয়; তাহা অবশ্যই ছিল এবং যেসব ক্ষেত্রে ছিল—তাঁহারা আজও বহির্জগতের কর্মক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী; আদর্শ ও কর্মপন্থাগত পার্থক্যসত্ত্বেও আমি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি ও তাঁহাদের উদ্দেশে অভিবাদন জানাই। কিন্তু সেদিন যাঁহারা আদর্শ নিষ্ঠা ছাড়া অপর কোন বস্তুর আকর্ষণে দলত্যাগ করিয়াছিলেন এবং দল ভাঙ্গার কার্যে প্রধান ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন, কর্মক্ষেত্র হইতে

করে যে তাঁহারা নীরবে পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন কেহ টেরও পাইল না। বিশেষ করিয়া এই শ্রেণীর ব্যক্তিরাই আঘাত হানিতে আরম্ভ করিলেন—জাতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মূল ঘেঁষিয়া : তাঁহাদের প্রচার-কার্যের মর্ম হইল—ধর্ম মিথ্যা, সাধনা ও সংযম মিথ্যা, বিপ্লব-প্রচেষ্টা মিথ্যা, বিপ্লবী-দলগুলির শ্রম ও সাধনা মিথ্যা, বিপ্লবীদের আত্মনিগ্রহ ও আত্মদান মিথ্যা, এক কথায় বলিতে গেলে, 'ক্ষুধিত পাষাণের' সেই পাগলা মেহের আলীর মত কারাপ্রাচীরের চারিধারে তাঁহারা দিবা-রাত্রি হাঁকিয়া বেড়াইতে লাগিলেন সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়! তাঁহাদেরই উত্তর-সাধকগণ আজও স্বাধীন ভারতের রাজপথে-পথে হাঁকিয়া বেড়াইতেছে, ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, ভুলো মৎ ভুলো মৎ!

এই বিকৃত-প্রচার-কার্য ধর্ম ও সংস্কৃতিগত ধারণা ও বিপ্লব-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণ তরুণ-চিত্তে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করিব : ১৯৩০ সালে কমিউনিস্ট-নেতা কম্‌রেড বুখারী সত্যাগ্রহী ও বিপ্লবী বন্দীদের মধ্যে মার্কসীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বহরমপুর জেলে রীতিমত বিদ্যালয় ও বক্তৃতা-মঞ্চ খুলিয়া বসিয়াছেন। অথচ সেই জেলে অবস্থান করিয়াই সালারের কেষ্টবাবু প্রতিদিন প্রত্যূষে স্নান করিয়া নিয়মিতভাবে আহ্নিক-পূজা ও ধ্যান-ধারণা করিতেন। একদিন তিনি যখন ধ্যানস্থ, দেখি, যেসব যুবক মিঃ বুখারীর নিকট হইতে পাঠগ্রহণ করিত তাহাদেরই একজন শিকারী বিড়ালের মত প্রখর দৃষ্টি চোখে লইয়া চার হাত-পায়ের উপর ভর করিয়া অতি সন্তর্পণে কেষ্টবাবুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া উদ্দেশ্য ভাল বলিয়া মনে হইল না, সে যখন ধ্যানস্থ কেষ্টবাবুর বেশ-কিছুটা কাছাকাছি গিয়াছে এবং পিছন হইতে তাঁহার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে

তাহার কাঁধে হাত রাখিলাম এবং সহসা স্পৃষ্ট হইবামাত্র তড়িতাহত হইয়া সে যেমন পিছন ফিরিয়া আমার দিকে চাহিল, আমি ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিয়া অন্তরালে লইয়া গেলাম। যতদূর মনে পড়ে, ছেলেটির নাম দীনেশ; আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার মতলবটা কি এবং সে কি করিতে যাইতেছিল। দীনেশ বলিল, সে কেষ্টবাবুকে ধাক্কা মারিয়া পরীক্ষা করিতে যাইতেছিল তাঁহার ধ্যান প্রকৃত না ধাপ্পাবাজী। আমি সবিস্ময়ে পরীক্ষার পদ্ধতি ও প্রমাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ছেলেটি বলিল, সে পিছন হইতে সহসা কেষ্টবাবুকে ধাক্কা মারিত, তাহার ফলে তিনি যদি চমকাইয়া ফিরিয়া চাহিতেন তাহা হইলে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া যাইত যে, তিনি বাস্তবিক পক্ষে ধ্যান করিতেছেন না, ধ্যানের ভাণ করিতেছেন মাত্র; কারণ সত্যকার ধ্যান অত সহজে ভঙ্গ হয় না, ইহাই তাহার বিশ্বাস। তাহার কথা শুনিয়া হাসিব না তিরস্কার করিব ভাবিয়া পাইলাম না; মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেখানে অনিষ্টকর অথবা অভিসন্ধিমূলক মনোভাব ছায়া পর্যন্ত পাত করে নাই; মর্মান্তিক বেদনার সহিত উপলব্ধি করিলাম, এমন সরল ও উদার হৃদয় এক তরুণের কুসুমের মত কোমল ও নিষ্পাপ মনে সংশয়ের যে কীট বাসা বাঁধিয়াছে ইহা তাহারই দংশনজনিত জ্বালার অভিব্যক্তি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তো নিয়মিত ব্যায়াম কর? সে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে আমি পুনরায় বলিলাম, বুক পাত, তোমার বুকে ঘুষি মারিয়া পরীক্ষা করিতে চাই, তুমি সত্যি ব্যায়াম কর অথবা ব্যায়ামের ভাণ কর মাত্র। আমার এই আকস্মিক প্রস্তাবের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সে দুইটি চোখে বিস্ময় ও প্রশ্নভরা দৃষ্টি লইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমি বলিলাম, আমার ঘুষির আঘাত যদি তুমি অনায়াসে বুকে সহ্য করিতে পার, তাহা হইলে বুঝিব তোমার ব্যায়াম

করা সত্য ; কেমন, পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত ? সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃষ্টি নত হইল মৃত্তিকার দিকে ; বুঝিলাম, আমার কথার তাৎপর্য হয়তো এতক্ষণে তাহার চৈতন্যের সীমা স্পর্শ করিয়াছে : সহানুভূতিপূর্ণ সস্নেহ-কণ্ঠে বলিলাম, তুমিও ব্যায়াম কর এবং ভীম ভবানী ও রামমূর্তিও ব্যায়াম করেন ; তাঁহারা সচ্ছন্দে বুকের উপর বিরাট পাথর চাপাইয়া তাহার উপরে লোহার হাতুড়ির আঘাত সহ্য করেন, অথচ আমার ঘুষির ঘায়ে তোমার বুকের একখানা পাঁজরা হয়তো ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমার ব্যায়াম করা মিথ্যা নয় ; তোমার ও ব্যায়াম-বীরগণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুদীর্ঘ সাধনার ফলে তাঁহাদের পেশী যে অনমনীয় দৃঢ়তা অর্জন করিয়াছে, তোমার পেলব-পেশী এখনও তাহা করে নাই, কিন্তু করিবার উচ্চাশা পোষণ করে। তেমনি ধাক্কা খাইয়াও যাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় না, দেহটা বল্মীক-স্তূপের তলে জীবন্ত-সমাহিত হওয়া সত্ত্বেও ধ্যান যাঁহার অটুট, কেষ্টবাবুর ধ্যান আজও তাঁহার ধ্যানের গভীরতা লাভ করে নাই বলিয়া তাহাকে কি তুমি ধাপ্পাবাজী বলিবে ? সংশয় এবং সংজ্ঞা তরুণ-চিত্তের উপর দিয়া পর্যায়ক্রমে আলোক ও অন্ধকারের যে চঞ্চল রেখাপাত করিয়া চলিয়াছে, পালাক্রমে তাহার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে তাহার চোখে-মুখে ; বেদনার্ত চিত্তে সেই আত্মিক-আলোড়ন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম, আর ভাবিতে লাগিলাম, চোখের সম্মুখে এই মুহূর্তে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা তো একক ও বিক্ষিপ্ত কোন ঘটনা মাত্র নয়, বাংলার জেলসমূহে অহরহ যাহা ঘটিয়া চলিয়াছে ইহা তাহারই প্রতীক স্থানীয় ঘটনা। জীবন-নীতির নূতন ভিত্তি পত্তন হইবার পূর্বেই পুরাতন ভিত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করা হইতেছে, দিনে দিনে তাহা ভরিয়া উঠিতেছে শাসন-বন্ধনহীন অনিয়ম ও অনাচার দ্বারা, বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচার দ্বারা।

নবতর একটা বিশ্ব-সংস্কৃতির যাহারা হইবে ধারক ও বাহক, নূতন একটা আদর্শ ও আন্দোলনের যাহারা হইবে আধার, এই চরিত্রহীন ও বৈশিষ্ট্য-বিহীন শূন্যবাদই কি তাহাদের গঠনের যোগ্য উপাদান? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

"দিনের আলো যার ফুরালো
রাতের আলো জ্বললো না"—

সেই হতভাগ্যরাই আজ ঘাটের কিনারায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে; তাহাদের জন্য গভীর সমবেদনায় আলোড়িত বক্ষ হইতে দীর্ঘশ্বাসমুখে বাহির হইয়া আসিল রবীন্দ্রনাথেরই সেই ব্যথিত প্রশ্ন:

ঘরেও নয়, পারেও নয়, যেজন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে!"

এগারো

চোর-ডাকাতের সঙ্গে

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়িয়া গেল স্বামী অখণ্ডানন্দের তেজোদৃপ্ত তিরস্কার-বাণীর কথা। তৎপূর্বে তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়ের ইতিহাসটা বর্ণনা করিয়া রাখি: স্বামীজী তখন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ। সেদিন ছিল একাদশী, বাবা মধ্যাহ্ন-ভোজন না করিয়াই কোর্টে গিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন, খাবার প্রস্তুত হইলে আমি যেন গাড়ী লইয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য আদালতে যাই। দুপুর বেলায় গাড়ী হইতে আদালত-প্রাঙ্গনে নামিয়া দেখি, গৈরিকবাস-পরিহিত এক সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসী একটি গাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছেন। গৈরিকের প্রতি যে

সহজাত আকর্ষণ অশৈশব আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহাই আমাকে অজ্ঞাতসারে টানিয়া লইয়া চলিল সন্ন্যাসীর নিকটে। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আমার কোর্টে আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে স্বামীজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, একাদশীতে আমিও তো অভুক্ত, আমাকে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবে না? সে প্রশ্নে কিশোর-চিত্ত আমার আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল; বলিলাম, নিশ্চয় করিব, আপনি যাইবেন আমাদের বাড়ী! ছুটিয়া বার-লাইব্রেরীতে গিয়া বাবাকে ডাকিয়া আনিলাম; আসিতে আসিতে পথে স্বামিজীর কথা বাবাকে সবিস্তারে শুনাইয়া দিয়া বলিলাম, যেমন করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেই হইবে। হইলও তাহাই। বাবা কোন কথা বলিবার পূর্বেই স্বামীজি বলিলেন, আপনার ছেলের নিমন্ত্রণ আমি আগেই গ্রহণ করিয়াছি। এখন চলুন গাড়ীতে উঠি। কৈশোর-জীবনের সেদিনের সেই শুভক্ষণে স্বামিজীর স্নেহলাভের যে দুর্লভ সৌভাগ্য আমার ঘটে, তাঁহার মর-জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাহার অকুণ্ঠ আশীর্বাদ হইতে আমি দিনেকের তরেও বঞ্চিত হই নাই।

পুনরায় পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। উল্লিখিত ঘটনার বহুদিন পরের কথা: সেদিন বহরমপুর স্কোয়ার ফিল্ডে মুর্শিদাবাবাদের নবাব বাহাদুরের দলের সহিত বহরমপুর ইউরোপীয় দলের পোলো-ম্যাচ খেলা হইবে; সেদিনের খেলার বৈশিষ্ট্য এই যে, নবাব বাহাদুর নিজে সেদিন মাঠে নামিবেন। মাঠে গিয়া দেখি, খেলা তখনও আরম্ভ হয় নাই, স্বামিজী একান্তে এক গাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমি এবং বন্ধু ধীরেন গিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিলাম। আমি বলিলাম, চলুন, আর একটু আগাইয়া যাই, তাহা না হইলে নবাব বাহাদুরকে এখান হইতে স্পষ্ট দেখা যাইবে না। ধীরেন অত্যন্ত তৎপরতার সহিত বলিয়া বসিল, কি দেখিব নেড়ে বেটাকে; কাছে গেলে গায়ের পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ নাকে

লাগিবে। ধীরেন হয়তো ভাবিয়াছিল, তথাকথিত এই হিন্দুয়ানীর বহর দেখিয়া স্বামিজী সন্তুষ্টই হইবেন, কিন্তু ফল হইল বিপরীত: তাহার সদা-প্রসন্ন আনন ছাইয়া নামিয়া আসিল অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের ছায়া; কিছুক্ষণ মৌন থাকিবার পর তিনি বলিলেন, পেঁয়াজ রসুনের গন্ধের কথা স্মরণ করিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছিলে, না? কিন্তু তোমাদের গা দিয়া কিসের গন্ধ বাহির হয়—তোমরা সম্ভবত নিজে তাহা টের পাওনা, তাহা বহু শতাব্দীব্যাপী গোলামীর উৎকট পচা দুর্গন্ধ! নবাব বাহাদুরের পূর্ব পুরুষগণ স্বাধীন বাংলার মসনদ হারাইয়াছেন মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্বে, কিন্তু তোমরা পেঁয়াজ রসুনের পয়জার পুরুষানুক্রমে মাথায় বহিয়াছ কত শতাব্দী ধরিয়া সেকথা স্মরণ হয় কি? জাতীয় মর্যাদা যদি ফিরিয়া পাইতে চাও, বিজাতীয় বিদ্বেষ অথবা ঘৃণার পথে তাহা কদাচ পাইবে না, তাহার জন্য প্রয়োজন হারাইয়া-যাওয়া জাতীয় চরিত্র পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া। পৌরাণিক একটা কাহিনী শোন: দৈত্যপতি প্রহ্লাদ তখন স্বর্গের অধীশ্বর এবং দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ হইতে নির্বাসিত হইয়া মর্ত ও পাতালের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধারের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি উপদেশ লাভের আশায় গেলেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে; তিনি বলিলেন, দেখ হে বাপু, প্রহ্লাদের পরাক্রম বাহুতে বাস করে না, চরিত্রই তাহার এক মাত্র আধার; সুতরাং প্রহ্লাদ চরিত্রবলে যতক্ষণ বলীয়ান, ততক্ষণ সে অপরাজেয়।

শুক্রাচার্যের বাণী শুনিয়া দেবরাজ তাঁহার কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন: এক ব্রাহ্মণ বালকের বেশ ধরিয়া তিনি পরিচারক নিযুক্ত হইলেন প্রহ্লাদের। দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত সেবায় ও পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রহ্লাদ একদা ইন্দ্রকে বলিলেন, কে তুমি ব্রাহ্মণ বালক—সতত ছায়ার মত পার্শ্বে থাকিয়া আমার সেবা করিতেছ! তোমার

একনিষ্ঠ সেবা-পরিচর্যায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি ; বল, তুমি কি চাও, তোমাকে অদেয় আমার কিছু নাই। ছদ্মবেশী দেবরাজ কপট প্রভুভক্তির ভাণ করিয়া বলিলেন, আপনার সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছি ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য, ইহা ছাড়া আমার কাম্য আর কিছু নাই। তথাপি সদয় হইয়া আপনি যদি আমাকে কোন বর দিতেই চান, তাহা হইলে আপনার চরিত্র দান করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। যাজ্ঞার কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ চকিত হইয়া বলিলেন, আমার চরিত্র চাও! একী অদ্ভুত প্রার্থনা তোমার বালক! চরিত্র লইয়া তুমি কি করিবে? রাজ্য, ঐশ্বর্য, সম্পদ, শক্তি—যাহা মন চায় তুমি প্রার্থনা কর, এই মুহূর্তে তাহা পূর্ণ করিব!

অতিশয় কুণ্ঠার সহিত দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন, বর চাহিবার জন্য আপনি আদেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি চাহিলাম, দান করিতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, দিবেন না ; কেবল সেবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন না—ইহাই একমাত্র ভিক্ষা।

অত্যন্ত তৎপরতার সহিত প্রহ্লাদ বলিলেন, কিন্তু তাহা হইবার নয় ; প্রতিশ্রুতি যখন দিয়াছি তখন যে কোন মূল্যে তাহা প্রতিপালিত হইবেই, তজ্জন্য স্বর্গরাজ্য হইতে যদি আমাকে বঞ্চিত হইতে হয় তাহাও স্বীকার। ব্রাহ্মণ বালক, তুমি যেই হও, করপুট প্রসারণ করিয়া দান গ্রহণ কর, আমি আমার চরিত্র তোমাকে দান করিতেছি। দান গ্রহণ করিবার পর দেবরাজ নিজমূর্তি ধারণ করিয়া দৈত্য-সভা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে প্রহ্লাদ বসিয়া আছেন, এমন সময় তিনি লক্ষ্য করিলেন, একটি ছায়ামূর্তি তাঁহার শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, চমকিত হইয়া প্রহ্লাদ প্রশ্ন করিলেন, আপনি কে ছায়ামূর্তি বলিলেন,

আমি সত্য। প্রহ্লাদ বলিলেন, কিন্তু আপনাকে তো আমি ত্যাগ করি নাই, আপনি চলিয়া যাইতেছেন কেন?

ছায়ামূর্তি বলিল, চরিত্র যেখানে নাই সত্য সেখানে অবস্থান করিবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া? তাহার পর ধর্ম বিদায় হইল চরিত্র ও সত্যহীন জীবন হইতে, ধর্মের পশ্চাতে আসিল শক্তি এবং শক্তিকে অনুসরণ করিয়া বাহির হইয়া আসিল এক মহিয়সী নারী-মূর্তি। প্রহ্লাদের বিস্মিত ও ব্যথিত প্রশ্নের জবাবে আত্মপরিচয় দান করিবার জন্য তিনি বলিলেন, আমি লক্ষ্মী। তোমার চরিত্রহীন জীবনে সত্যের স্থান নাই; সত্য যেখান হইতে নির্বাসিত ধর্ম সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না; ধর্মহীন আধার শক্তি-ধারণের যোগ্যপাত্র নয় এবং শক্তিহীন নির্বীর্য ব্যক্তির পক্ষে রাজলক্ষ্মী দুর্লভ—উদ্যোগী পুরুষসিংহই লক্ষ্মীলাভের একমাত্র অধিকারী।

পৌরাণিক কাহিনী সমাপ্ত করিবার পর স্বামিজী বলিলেন, যে চরিত্র হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গরাজ্য প্রহ্লাদের অধিকার হইতে আপনা হইতেই স্খলিত হইয়া পড়িল, সেই চরিত্রহীনতাই তোমাদের সকল দুঃখ ও দুর্গতির মূলীভূত কারণ; চরিত্রের অনুশীলন কর, আবার সব সুখ ও সৌভাগ্য তাহাকে অনুসরণ করিয়া অনাহুত অতিথির মত তোমাদের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইবে। স্বামিজী যখন নীরব হইলেন, খেলোয়াড়গণ তখন মাঠে নামিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু যে আগ্রহ ও আকর্ষণ লইয়া খেলা দেখিতে আসিয়াছিলাম, তাহার চিহ্নমাত্র তখন আর আমার মনে নাই; এমন কি, খেলোয়াড়গণ তখন আর আমার দৃষ্টির সম্মুখে নবাব বাহাদুরের দল এবং ইউরোপীয় দলে বিভক্ত নয়, মনে হইল, চরিত্রবলে বলীয়ান এক জাতীয় সংহতির সহিত জাতীয় চরিত্র বর্জিত এক বিক্ষিপ্ত জনসমষ্টি অসম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে; সে প্রতিযোগিতার পরিণাম অনিশ্চিতও নয়, কৌতূহলের সহিত অপেক্ষনীয়ও নয়।

কথায় কথায় বক্‌সা প্রসঙ্গ হইতে বহু দূরে চলিয়া আসিয়াছি : আদর্শে আদর্শে বিরোধিতা, মতবাদে মতবাদে সংঘাত, জনে জনে অবিশ্বাস, দলে দলে অভিসন্ধি—সমগ্র শিবিরের আবহাওয়া যেন বিকৃত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। কুয়াসা ঘন হইয়া আসিলে তাহার যবনিকার মধ্য দিয়া অনতিদূরের অতি পরিচিত ব্যক্তিকেও যেমন অচেনা ও অদৃষ্টপূর্ব বলিয়া মনে হয়, পারস্পরিক সংশয় ও অবিশ্বাসের নিবিড় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া বন্দীদের ব্যক্তিগত সম্পর্কও তেমনি অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে ; ফলে দল ও মতবাদ নির্বিশেষে সে স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত হাস্য-পরিহাস নাই, অবাধ মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনা নাই। কমিউনিষ্ট প্ররোচনা ও প্রচার-কার্যের বেড়াজাল হইতে বিপ্লবী-দলগুলি তাহাদের তরুণ ও তরল-চিত্ত-সভ্যদের বাঁচাইবার জন্য যতখানি ব্যস্ত, নবদীক্ষিত সদস্যদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত কমিউনিষ্ট পার্টির ব্যস্ততা তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। সমরনীতির মত রাজনীতিক্ষেত্রেও আক্রমণই আত্মরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়রূপে পরিগণিত ; সেই নীতি অনুসরণ করিয়া পারস্পরিক আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের যে পালা চলিল কৃষ্ণনগর জেলের একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা তাহা স্মরণ করাইয়া দেয় : ১৯৩২ সালের মে-জুন মাসে আমরা যখন কৃষ্ণনগর জেলের বন্দী, শান্তিপুর রাসের মেলায় হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া এক প্রবীন পকেটমার তখন সেখানে আসিল ; তাহার বয়স তখন প্রায় ষাট বৎসর, অথচ দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া কারবার চালানোর কালে ইহাই তাহার দ্বিতীয় দণ্ড ; প্রথমবার সে ধৃত হয় তরুণ যৌবনের অপটু হাতের আড়ষ্টতার দরুণ এবং দ্বিতীয়বারে সে ধৃত হইয়াছে প্রবীন বয়সের দুর্বলতাজনিত কম্পিত হস্তের কল্যাণে। একদিন আমি তাহার নিকট প্রস্তাব করিলাম, দেখ মুরুব্বী, কবে যে জেল হইতে বাহির হইব তাহা ঠিক নাই এবং যখনই

বাহির হই, কি উপায়ে যে জীবিকা নির্বাহ করিব তাহারও কোন স্থিরতা নাই ; এরূপ ক্ষেত্রে তুমি যদি দয়া করিয়া তোমার বিদ্যাটা হাতে-কলমে শিখাইয়া দাও, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। মুরব্বী সানন্দে রাজী হইলেন এবং গম্ভীরভাবে আমাদিগকে পকেটমারা-বিদ্যায় নিয়মিত পাঠ দিতে লাগিলেন। এই সূত্রে পকেটমারের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা একটু ঘনতর হওয়ার ফলে রাজবন্দীদের সহিত সাধারণ কয়েদীদের সম্পর্কের ভারকেন্দ্রটা বেশ একটু বিচলিত হইয়া উঠিল, ফলে আমাদের পরিচারকরূপে নিযুক্ত সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল পারস্পরিক সংশয় ও অবিশ্বাসের মনোভাব।

ডাকাতির অপরাধে দণ্ডিত লোকটি একদা আমাদের ঘরে বসিয়া কথা কহিতেছে, চোর মহাশয় অন্তরালে রহিয়া তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং ডাকাত চলিয়া গেলে ঘরে ঢুকিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু, ডাকু বেটা কি বলিতেছিল, আমার নিন্দা করিতেছিল বোধ হয়? তাহা করুক, আপত্তি নাই, কিন্তু উহার নিকট হইতে সাবধানে থাকিবেন। আপনারা হয়তো বলিবেন, তুমিই বা কোন্ সাধু! তাহা নই সত্য ; আমরা চুরি করি বটে, কিন্তু দু-চার টাকার জন্য মানুষ খুন করা আমাদের পেশা নয়। উপদেশ অনুযায়ী কার্য করিব—এই আশ্বাস আদায় করিয়া লইয়া সে প্রস্থান করিলে ডাকাত আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং মুখখানা যথাসম্ভব গাম্ভীর্য মণ্ডিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, চোরা ব্যাটা হাত মুখ নাড়িয়া কি বলিতেছিল, নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে চুগলী করিতেছিল? তাহা করুক, কিন্তু বাবু, সাবধান করিয়া দিই, চোরা ব্যাটাকে অত কাছে ঘেঁসিতে দিবেন না। ও ব্যাটাদের কি বিশ্বাস আছে। ঘটিটা-বাটীটা হাতের কাছে যাহা পাইবে তাহা লইয়া

চম্পট দেওয়াই উহাদের কারবার। আমরা অবিশ্যি সাধু নই, কিন্তু আমাদের নজর ভাগাড়ের দিকে থাকে না, আমরা মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। এদিকে পকেটমার মুরুব্বি মশাই চোর-ডাকাতের ভাষণ না শুনুন, দূর হইতে তাহাদের ভাব-গতিক লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সম্ভবত আশঙ্কা করিয়াছেন, রাজবন্দী-মহলে তাঁহার প্রসার-প্রতিপত্তি খর্ব করিবার জন্য দস্যু-তস্করের ইহা যৌথ অভিযান। চোর-ডাকাত অপেক্ষা সে চতুর লোক, কাজেই তাহার প্রতিবাদ ও প্রচার-কার্য কিছুটা সূক্ষ্ম হওয়াই স্বাভাবিক। ঘরে ঢুকিয়াই চোখে-মুখে যথাসম্ভব ঘৃণার ভাব আনিয়া সে বলিতে লাগিল, চোর-ডাকাতের পাল্লায় পড়িয়া ঘেন্নায় মরি মশাই, ঘেন্নায় মরি! অবশ্য আমরাও সাধু নই, কিন্তু (দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দুইটিকে কতকটা কাঁচির আকারে রূপান্তরিত করিয়া ভাব-অভিব্যক্তি সহকারে) আমাদের পেশায় ও-সব নোংরামী নাই, যাহা করিবার যথাসম্ভব ভদ্রভাবে ও সাফাই হাতে তাহা সারিয়া লই। আমাদের পেশা, ডিসেণ্ট প্রফেসন্ মশাই—ডিসেণ্ট প্রফেসন্। জগতের যে-কোন ক্ষেত্রে বিরোধী-প্রচার-কার্যের ইহাই নমুনা: কি শিবিরের সঙ্কীর্ণ রাজনীতি-ক্ষেত্রে, কি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে পারস্পরিক কুৎসার প্রচারকার্য চলিয়াছে অবিকল এই পদ্ধতিতে; উত্তম পুরুষ হিসাবে 'আমি' সর্বনামটি সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটী ও দুর্বলতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত রহিয়া বিশ্ব-মানবতার বিচ্যুতির প্রতি কখনও কৃপা-কটাক্ষ আবার কখনও বা রোষদৃষ্টিপাত করিতেছে।

বারো

পাগলা গারদ

কারাগারের বদ্ধ এবং গুমোট আবহাওয়ায় স্বভাবতঃই দম বন্ধ হইয়া আসে, তদুপরি কারা-কর্তৃপক্ষ যদি ভাগ্যক্রমে এরূপ উৎসাহী ও কর্মতৎপর হন যে তাঁহার আচরণে বন্দিগণকে প্রতিপদে ও প্রতিমুহূর্তে বেদনার সহিত তাহাদের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিতে বাধ্য হইতে হয়, সে ক্ষেত্রে শ্বাসরোধকারী সে-আবহাওয়া জীবনধারণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া উঠে। বক্সার বন্দিগণ সৌভাগ্য-ক্রমে সেইরূপ একজন কারাধ্যক্ষের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল মিঃ কোটামের মধ্যে। প্রতি-দিনের ইচ্ছাকৃত অপমানজনক আচরণে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত রাজবন্দিদের পক্ষ হইতে ইতিপূর্বেই তাঁহার উপর দিয়া পাদুকা প্রহার চলিয়া গিয়াছে। কাজেই কোটাম সাহেবের অবস্থা হইয়া আছে অনেকটা গুলি-খাওয়া বাঘের মত; প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি সর্বদাই সুযোগ খুঁজিতেছেন, নিত্য নব বিরক্তিকর আদেশের আল্‌পিন ফুটাইয়া যুদ্ধ-পরিস্থিতি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। সংঘর্ষের সুযোগ আসিতে বিলম্ব হইল না এবং তাহা আসিল সুরপতি চক্রবর্তীকে উপলক্ষ্য করিয়াঃ সুরপতিবাবুকে দুই একদিন "রোল কলের" সময় পাওয়া যায় নাই। সুরপতিবাবুর মতে প্রকৃতির অনস্বীকার্য আহ্বানই নাকি তাঁহার অনুপস্থিতির হেতু। সংঘর্ষের দিন বিকালের দিকে মাঠে ফুটবল ম্যাচ হইতেছে. আমি এবং সুরপতিবাবু পাশাপাশি বসিয়া খেলা দেখিতেছি, এমন সময় কোটাম সাহেবের খাস আর্দালী আসিয়া জানাইল—সাহেব সুরপতিবাবুকে স্মরণ করিয়াছেন। উত্তরে সুরপতি বাবু বলিলেন, সাহেবকে গিয়া বল, খেলা

শেষ হইলেই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিব। আর্দালী চলিয়া গেল; তাহার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, কোটাম সাহেব সসৈন্যে আসিয়া মাঠে নামিলেন এবং একদল সশস্ত্র সিপাই আসিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে মাঠ হইতে কিছুটা উচ্চে এক সুবিধাজনক স্থান গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সঙ্গে সঙ্গে খেলা ভাঙ্গিয়া গেল, সানুচর কোটাম সাহেব কৌতূহলী রাজবন্দিদের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গেলেন! অতঃপর সুরু হইল উভয় পক্ষে টানাটানি ও ধাক্কাধাক্কি: কোটাম সাহেব চান—কারা-বিধি-লঙ্ঘনের অপরাধে সেই মুহূর্তে সুরপতিবাবুকে ধরিয়া লইয়া যাইতে এবং রাজবন্দিগণ বলিলেন—কোটাম সাহেব তখনকার মত সদলবলে মাঠ হইতে আফিসে চলিয়া যান, খেলা শেষ হইলে সুরপতিবাবু স্বয়ং আফিসে গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সাহেব সে প্রস্তাবে সম্মত নহেন, অথচ যে-চক্রব্যূহের মধ্যে তিনি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন—তাহা হইতে বাহির হইবার পথও তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না; সাহেব অগত্যা শ্রেণীবদ্ধ সান্ত্রীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, যদি এই মুহূর্তে সুরপতিবাবু সহ তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে গুলি চালাইতে আদেশ দিবেন। সাহেবকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল, গুলি যদি চলেই, সে পক্ষাপক্ষ বিচার করিয়া অঙ্গ স্পর্শ করিবে না এবং যদিই বা তাহা করেও, মরীয়া রাজবন্দিগণ অন্তত তাঁহার সদগতির একটা সুব্যবস্থা না করিয়া মরিবেন না। দ্বিধাগ্রস্ত হাতে সাহেব বাঁশীটা মুখে তুলিয়া লইলেন এবং তাহাতে ফুঁ দিবার পূর্বে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত একবার চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি পড়িল কোলে শিশুসন্তান সহ ফটকের বাহিরে দণ্ডায়মানা স্বীয় পত্নীর উপরে: রাজবন্দী পরিবেষ্টিত স্বামীর পরিণাম চিন্তা করিয়া মেম সাহেব তখন উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতেছেন। সান্ত্রিদের গুলি-ভরা বন্দুক স্থির লক্ষ্যে আমাদিগকে

নিরীক্ষণ করিতেছে; বাঁশী সাগ্রহে সাহেবের মুখলগ্ন রহিয়াছে মৃত্যু-সঙ্কেত-সূচক সামান্য একটি ফুৎকারের প্রতীক্ষায়; মনে হইতেছে, নিদারুণ সেই সঙ্কটক্ষণে প্রতিটি মুহূর্তের আসা-যাওয়ার পদশব্দ যেন সুস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। সাহেবের দম্ভ ও হঠকারিতা চাহিতেছে বাঁশীতে ফুৎকার দিতে, কিন্তু অদূরে রোরুদ্যমানা পত্নীকে দেখিয়া, তাঁহার বক্ষলগ্ন-শিশু-সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া সাহেবের স্বামিত্ব ও পিতৃত্ববোধ শ্বাসযন্ত্রে ততটুকু বায়ু সঞ্চারের মত শক্তিও অর্জন করিয়া উঠিতে পারিল না; ফলে বাঁশী অসহায়ভাবে সাহেবের অধরলগ্নই রহিয়া গেল। এমন সময় শান্তির দূতরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন সহকারী কম্যাণ্ডার ক্যাডমান সাহেব। তাঁহার মধ্যস্থতায় বিরোধের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া গেল; যে প্রলয়মেঘ এই মুহূর্তে দুর্যোগের ধারা বর্ষণ করিতে পারিত তাহা মুহূর্তে বাতাসে বিলীন হইয়া গেল শরতের শূন্যগর্ভ লঘু-স্বচ্ছ মেঘখণ্ডের মত; কিন্তু রাজবন্দিদের বুঝিতে বাকী রহিল না, যে দুর্যোগ ঘনাইয়া উঠিয়াও আজ অবস্থাগতিকে মিলাইয়া গেল তাহা যে কোন মুহূর্তে পুনরায় উদিত হইয়া কোটাম-শাসিত বক্সা শিবিরের মাথায় সরোষে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে।

একদিকে শিবিরের বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান এই সম্ভাবনা এবং অপরদিকে অভ্যন্তরে দলীয়-দ্বন্দ্ব, উপদলীয় চক্রান্ত, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও আদর্শগত সংঘাত—ঘরে-বাহিরে এই দ্বিবিধ সঙ্কট যখন নিবিড়তর হইয়া ঘনাইয়া উঠিতেছে, রাজবন্দীদের মনোজগতে তখন ক্ষিপ্ততা আসিয়া লঘু ও ক্ষিপ্র পদক্ষেপে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল:

দেখিতে দেখিতে পাগলামী প্রায় সংক্রামক আকারে আত্মপ্রকাশ করিল; আজ সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত যাহাকে দেখিলাম সুস্থ ও স্বভাবিক

মানুষ, পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখি, তাহার বাক্য এবং আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সকালে কীচেন-রুমে গিয়া দেখি, ঢাকার জগদীশ চক্রবর্তী দুই একজন বন্ধুবান্ধবসহ এক নম্বর চৌকায় বসিয়া চা পান করিতেছেন। নিতান্ত সামাজিকতার খাতিরেই বলিলাম, জগদীশবাবু যে, বলি, আছেন কেমন?

জগদীশবাবু চায়ের পেয়ালায় একটা সজোরে চুমুক মারিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আছি কেমন? তবে শুনুন কেমন আছি: এই বলিয়া বাম হস্তের বৃদ্ধ এবং তর্জনী অঙ্গুলীদ্বয় চুটকিবদ্ধ করিয়া অর্ধ-নিমিলিত নেত্রে সুর করিয়া গান ধরিলেন, 'চাঁদ হাসে মোর দশা দেখে ভাঙ্গা মেঘের ফাঁকে লো ভাঙ্গা মেঘের ফাঁকে!'

ভাবগতিক দেখিয়া আমি ভড়কাইয়া গেলাম; জগদীশবাবু যথাযোগ্য সমীহর সহিত আমার সঙ্গে কথা-বার্তা কহিয়া থাকেন, কাজেই তাঁহার নিকট হইতে সুর-সহযোগে এই সঙ্গীত-সম্বর্ধনা আমি আদৌ আশা করি নাই।

তাঁহার সঙ্গা-বন্ধুদের মধ্যে একজন আমার বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া ইসারায় বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, কর্ম কাল রাত্রে সাবাড় হইয়া গিয়াছে, কিছু মনে করিবেন না।

একদিন অপরাহ্ণে খেলা শেষ হইলে মাঠ হইতে ব্যারাকে ফিরিয়াছি, শুনিলাম—ময়মনসিং-এর হিমাংশু আইনের কাজ ফর্সা হইয়া গিয়াছে। রাজবন্দীরা মাঠ হইতে ভিতরে আসিবার পর সান্ত্রীরা টহল দিতে গিয়া দেখে, একজন স্বদেশীবাবু, মাঠের এককোণে চুপটি করিয়া বসিয়া আছেন। তাহাদের ধারণা হইল, বাবু বোধ হয় চম্পট দিবার মতলব আঁটিয়া বাহিরে রহিয়া গিয়া থাকিবেন, তাহারা তাঁহাকে ভিতরে লইয়া

যাইবার চেষ্টা করিলে হিমাংশুবাবু উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, দোহাই মহারাণী! আমাকে ভিতরে লইয়া যাইও না।

ইহা যে মানসিক বৈলক্ষণ্যের সূচনা—কারা-কর্তৃপক্ষের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। হিমাংশুবাবু ক্যাম্পের ভিতরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু এই শপথ সঙ্গে লইয়া যে, মানুষের মুখ তিনি আর দেখিবেন না; সেই দিন হইতে হিমাংশুবাবু সেই যে দুই চোখ বন্ধ করিলেন, বক্সায় থাকা-কালে তিনি আর তাহা খুলিয়া মানুষের চোখে চোখ মিলাইলেন না।

একদিন রাত্রি প্রায় এগারটার সময় পাঁচ নম্বর ব্যারাকের বারান্দায় বসিয়া নৈশ-সৌন্দর্য সম্ভোগ করিতেছি এমন সময় ফরিদপুরের নকুল ধর আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল। দুই চারিটি বাক্য বিনিময়ের পরেই বুঝিতে পারিলাম, আলাপের মধ্যে কেমন যেন একটা অসংলগ্নতা ও খাপ-ছাড়া ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

এই ঘটনার প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরেই শুনিতে পাইলাম, পাশের ব্যারাকে নকুল ধরের বীভৎস 'হরিবোল' ধ্বনি; নিকটে গিয়া দেখি, কীচেন-ম্যানেজার আন্দুবাবুকে আহত করিয়া নকুল ধর খাটের উপরে দাঁড়াইয়া হরিবোল ধ্বনির তালে তালে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে।

সেইদিন হইতে তাহার তত্ত্বাবধানের সমূহ দায়িত্ব আমার হাতে আসিল, আমার উপস্থিতি ব্যতিরেকে তাহার স্নান, আহার, নিদ্রা বিহার কিছুই হইত না। তাহাকে লইয়া একান্তে যখন বসিতাম, নকুল ধর মাঝে মাঝে চেষ্টা করিত তাহার অবস্থান্তরের হেতু ব্যাখ্যা করিতে; গম্ভীরভাবে আরম্ভ করিয়া সে দুই একটি বাক্য বলিতও স্বাভাবিকভাবে, কিন্তু সেভাব বেশীক্ষণ বজায় রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না, অচিরে অর্থহীন অসংলগ্নতা আসিয়া আলাপের মধ্যে ছেদ রচনা করিত। নকুল ধর বুঝিতে পারিত, সে যাহা বলিতে চাহিতেছে তাহা বলা হইল না;

এবং যাহা বলা তাহার ইচ্ছা নয়, কে যেন তাহার কণ্ঠে বসিয়া সেই কথাই বলিয়া দিতেছে। নিজের অক্ষমতায় ক্ষুব্ধ হইয়া সে যখন দুই হাত দিয়া মাথার চুল টানিত, কপালে করাঘাত করিত, গভীর সহানুভূতিভরে আমি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতাম, সস্নেহে উত্তপ্ত মাথায় হাত বুলাইতাম, সাদরে দুই চোখের জল মুছাইয়া দিতাম, উন্মত্ত-তাণ্ডব-নর্তনরত নকুল ধর অসহায় শিশুর মত আমার বক্ষলগ্ন রহিয়া অঝোরে অশ্রুবর্ষণ করিত।

বেদনার্ত বক্ষ আলোড়িত করিয়া, যাতনা-পীড়িত অন্তর মথিত করিয়া প্রশ্ন জাগিত : সরল ও উদার হৃদয় এই যুবকদের শোচনীয় এই পরিণতির জন্য দায়ী কে, এই পরিণতি রোধ করিবার পন্থা কি ও প্রতিকার কোথায় !

তাহার পর নোয়াখালির নীলকৃষ্ণ সাহা পাগল হইয়া গেল, ঢাকার অনুকূল দাস ক্ষেপিয়া গেল, পাবনার হারাণ চক্রবর্তী গম্ভীর ও মৌনী হইয়া গেল ; দেখিতে দেখিতে সে গাম্ভীর্য ও মৌনতার ছায়া পতিত হইল প্রতিটি রাজবন্দীর মুখে, সমগ্র শিবিরের পার্বত্য পরিবেশের উপর। আশঙ্কা হইল, সরকারি-বন্দীশিবির কি শেষপর্যন্ত রাজবন্দিদের উন্মাদাগারে পরিণত হইবে !

এক সাথে হর ও পার্বতীর শান্ত ও দুরন্তলীলার সে কি অপূর্ব সমাহার ! শিবিরের বাহিরে গিরিরাজ-দুহিতা পার্বতীর তনু-দেহ হইতে সৌন্দর্য যখন শতধারে ঝরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার ফুল-মালঞ্চ ভরিয়া উঠিয়াছে বিচিত্র কুসুম-সম্ভারে, শিবিরের অভ্যন্তরে পাগল ভোলানাথ তখন ভাঙ-ধুতুরার ঝুলি ঝাড়িয়া ক্ষেপা শিষ্যদের মুখে সস্নেহে তুলিয়া ধরিতেছেন অত্যুগ্র মাদকরসের পরিপূর্ণ পাত্র ; পার্বতীর চরণে যখন খর-ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিয়াছে নির্ঝরের নূপুর নিক্কণ, রুদ্রের বক্ষ বিলম্বিত অক্ষ মালায় তখন ধ্বনিয়া উঠিয়াছে সর্বনাশের সুর সংযোগে ধ্বংসের সঙ্গীত।

তের

ঝাঁঝরা ক্লাব

'ঝাঁজরা ক্লাবের' কাহিনী না বলিলে বক্সা-প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়ঃ

প্রতিদিন নৈশ ভোজনের পর ছয় নম্বর বি. ব্যারাকে একটি গল্পের আড্ডা বসিত। একটি মাত্র গল্পের নগদ চাঁদা দিয়া যে-কোন লোক সে আড্ডার সভ্য হইতে পারিতেন, তবে গল্প সম্বন্ধে কঠোর একটা সর্ত ছিলঃ

সে সর্ত হইল এই যে, হয় নিজের চোখে দেখা অথবা নিজের চোখে দেখিয়াছে এমন কোন লোকের মুখ হইতে শোনা গল্প চাই; পুস্তকে পড়া অথবা মুখে মুখে বানাইয়া বলা কোন গল্প চলিবে না এবং সেরূপ কোন গল্প চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে গিয়া কেহ যদি ধরা পড়িয়া যান, তাহা হইলে অতিরিক্ত পাঁচটি গল্পের 'পিটুনী কর' তাঁহার উপর ধার্য করা হইবে।

সে ক্লাবকে কেহ বা বলিতেন ভুতুড়ে ক্লাব, কেহ বলিতেন গুল্লির আড্ডা আবার কেহ বা বলিতেন গাঁজার আসর; কিন্তু কোন নামই আমাদের পছন্দসই হয় নাই বলিয়া সরকারীভাবে কোন নামই আমরা গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

অবশেষে সে নাম একদা সহসা এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তেমনি করিয়াই বাহির হইয়া আসিল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সান্যালের মুখ হইতে, আদি কবির শ্রীমুখ হইতে যেমন একদা নিঃসৃত হইয়াছিল প্রথম অনুষ্টুপ-ছন্দঃ

ক্লাবের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ জানানো

হইলে সুরেশবাবু পেস্তেন্সের পাতা তাস হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, কোন ক্লাবের সভ্য হতে হবে বললেন, ওই 'ঝাঁজরা ক্লাবের' ?

ঝাঁজরা ক্লাব! নামটা শুনিয়াই কেমন যেন একটু চমকাইয়া গেলাম ; নামের মধ্য হইতে নূতনত্বের আভাস আসিতেছে বটে, কিন্তু নামের অর্থ এবং তাৎপর্য ঠিক বোধগম্য হইতেছে না। একটু আলোক পাইবার আশায় জিজ্ঞাসা করিলাম, ঝাঁজরা ক্লাব মানেটা কি মশাই ? ক্লাবের সভ্য আপনি না হোন, কিন্তু নামের তাৎপর্যটা অন্তত বুঝিয়ে বলবেন তো ?

এতক্ষণে সুরেশবাবু তাস হইতে মুখ তুলিলেন এবং দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, মানে আবার বুঝিয়ে বলতে হবে নাকি ? মানেটা খুবই সোজা : জগদানন্দ বাজপেয়ী যে ক্লাবের সভাপতি এবং সুশীল দেব যার সম্পাদক সে ক্লাবের আবার সত্যি-মিথ্যার যাচাই আছে নাকি ? তার আগাগোড়া সবটাই মিথ্যা : অন্য কোন ক্লাবের যদি ছুঁচের মত একটি মাত্র ছিদ্র থাকে, সে ক্লাব ঝাঁঝরার মত হাজার ছিদ্রে ছিন্ন-ভিন্ন, কারণ পদাধিকারী ব্যক্তিদ্বয়ের একজন হলেন Professional thief এবং অপরজন Habitual liar."

চূড়ান্ত গালাগালি খাইয়াও আমরা খুসি না হইয়া পারিলাম না : যাঁহারা আমাদের ক্লাবকে গুলির আড্ডা বা গাঁজার আসর বলিয়াছেন গালাগালি দিতে তাঁহারাও কিছু কসুর করেন নাই ; কিন্তু তাঁহারা কেবল গালাগালিই দিয়াছেন, জুত-সই রকমের একটা নামকরণ পর্যন্ত করিতে পারেন নাই। সুরেশবাবু যে বিশেষণে আমাদিগকে বিভূষিত করিয়াছেন গৌরবের সহিত তাহা আমরা ধারণ করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু ক্লাবকে তিনি যে-নামে অভিহিত করিলেন আনন্দের সহিত তাহা আমরা বরণ করিয়া লইলাম।

যথারীতি অনুষ্ঠান সহকারে ক্লাবের নামকরণ-উৎসব সম্পন্ন হইল এবং নৈশ-বৈঠক দেখিতে দেখিতে বিচিত্র সে নামের আকর্ষণে নব নব সভ্য-সমাগমে সরগরম হইয়া উঠিল। কিন্তু সুরেশবাবু আমাদের প্রতি, বিশেষ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন ভাব যে কেন পোষণ করিতেন সেই কথাটা এখন পর্যন্ত বলা হয় নাই :

সুরেশবাবুর নিদারুণ বিদ্বেষ ছিল শরৎ-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এবং সে-সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠক ও উৎসাহী প্রচারক আমি ছিলাম বলিয়া সে বিদ্বেষের বাণ শরৎচন্দ্রের অঙ্গে আহত হইয়া ঠিকরিয়া আসিয়া পড়িত আমার গাত্রে।

ক্যাম্পের তরুণ বন্দীদের নৈতিক চরিত্র শরৎ-সাহিত্যের দূষিত সংক্রমন হইতে রক্ষা করিবার দুশ্চিন্তায় সুরেশবাবু সদা-সর্বদা বিব্রত থাকিতেন, অবশ্য তাহার জন্য পেশ্যেন্স খেলায় কোন ব্যাঘাত হইত বলিয়া মনে হয় না ; সকালে শয্যা ত্যাগ করিবার পর সেই যে বিছানায় তাস পাতা হইত, গভীর রাত্রে পুনরায় শয্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে-তাস আর তোলা হইত না ; তাহারই মধ্যে সময়ে সময়ে ক্বচিৎ কাহারও সহিত কথা-বার্তা ও আলাপ-আলোচনা যে না হইত তাহা নয়, তবে তাহা হইত তাস হইতে যতদূর সম্ভব চোখ না তুলিয়াই।

শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রীতির যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছিল অন্যান্য বন্ধুদের তাহা দৃষ্টি এড়াইল না এবং সুযোগ-সন্ধানী-ব্যক্তিরূপে সুশীল দেব, ধীরেন মুখার্জি ও সতীশ সরকার প্রমুখ জনকয়েক বন্ধু আমার অগোচরে সত্য-মিথ্যা নানা গল্প রচনা ও রটনা করিয়া সুরেশবাবুকে আমার বিরুদ্ধে এমন তাতাইয়া ও মাতাইয়া তুলিলেন যে, একদা রাত্রে সুরেশবাবু ঘোষণা করিয়া বসিলেন আমরণ অনশনের সঙ্কল্প। ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে বন্ধুরা

তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই, তাই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তাঁহারা প্রমাদ গণিলেন এবং সাব্যস্ত করিলেন যে, অনশন-সঙ্কল্প যখন আমারই চরিত্র ও আচরণের প্রতিবাদে, সে ক্ষেত্রে আকস্মিক সে-দৈব-দুর্ঘটনার সমুদয় দায়িত্ব আমারই; কাজেই সুরেশবাবুকে সে-সঙ্কল্প হইতে বিরত করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে আমাকেই।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা, নৈশ আহারের পর্ব সমাপ্তপ্রায়, কেবলমাত্র চাকর ও ঠাকুররা সুরেশবাবুর জন্য দায়ে ঠেকিয়া গিয়াছে। সেই মুহূর্তে ব্যারাকে সভা আহূত হইল এবং সভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, সুরেশবাবুর পায়ে ধরিয়া আমাকে মার্জনা ভিক্ষা করিতে হইবে এবং শপথ করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে শরৎ-সাহিত্য আর কোন দিন নিজে পাঠ করিব না, কাহাকেও পাঠ করিতে পরামর্শ দিবনা, কিম্বা রচনায় অথবা আলোচনায় শরৎ-সাহিত্য হইতে একটা মাত্র বাক্যও আমি উদ্ধৃত করিব না।

অভিযুক্ত আসামীর মত নতমস্তকে ও করযোড়ে সুরেশবাবুর পদপ্রান্তে গিয়া আসন গ্রহণ করিলাম এবং শপথ করিলাম, নিষিদ্ধ-কার্য করা হইতে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য নিরস্ত থাকিতে চেষ্টা করিব; কিন্তু চরিত্র-সংশোধনের কার্য আরম্ভ হইয়াছে একটু অসময়ে, এই কারণে ক্বচিৎ কোনদিন পতন ও পদস্খলন যদি ঘটিয়াই যায়, সুরেশবাবু যেন নিজগুণে তাহা মার্জনা করেন।

নিজ সঙ্কল্পে তথাপি তিনি অটল: যে প্রতিশ্রুতি অতীতে আমি বহুবার দিয়াছি এবং তাহার পবিত্র মর্যাদা প্রতিবারেই ভঙ্গ করিয়াছি, ভবিষ্যতে তাহা যে আমি পালন করিব তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তবে প্রতিশ্রুতি মৌখিক মাত্র না হইয়া যদি লিখিত আকারে প্রদান করা হয় এবং চৌকার দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ যদি সে-প্রতিশ্রুতি পালিত

হওয়া সম্পর্কে জামিন ও জিম্মা থাকেন তাহা হইলে বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেও হইতে পারেন।

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, উত্তম প্রস্তাব!

সেই মুহূর্ত্তে অঙ্গিকার-পত্রের খসড়া রচিত হইল, সকলের সমক্ষে সব সর্ত মানিয়া লইয়া আমি তাহাতে স্বাক্ষর করিবার পর জিম্মা ও জামিনদারগণ একে একে নিজেদের স্বাক্ষর অঙ্কিত করিলেন।

অঙ্গিকার-পত্রখানা আদ্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ ও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর সুরেশবাবু স্মিতহাস্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন; তাঁহার সে হাসির রেখা ঘনায়মান দুর্যোগ অন্ধকারের বুকে রবি-রশ্মির মত ঝলসিয়া উঠিল। নিতান্ত স্নেহপ্রবণ, স্বল্পভাষী ও লোক-সংসর্গ-বিমুখ এই ব্যক্তিটি বক্‌সার বন্দী সাধারণের নিকট হয়তো অপরিচিত, কিন্তু প্রচ্ছন্নতার পর্দা ঠেলিয়া যে কেহ তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াছে সংবেদনশীল একখানি দরদী বুকের কোমল ও আতপ্ত স্পর্শের দ্বারা সে প্রভাবিত না হইয়া পারে নাই।

চৌদ্দ

চিত্ত-তীর্থের সন্ধানে

কিন্তু যে বস্তুটির সন্ধানে আমি বিশ্বের চলার পথে বাহির হইয়াছি, কোটাম-সেরেস্তা তাহার সাক্ষাৎ লাভের যোগ্যস্থান নয়; হৃদয়বৃত্তির সেই জীবন্ত সমাধিস্থান পশ্চাতে ফেলিয়া পুনরায় বাহির হইব অন্তরের সেই অন্ধকার খনির সন্ধানে—প্রেমের স্পর্শমণি ও সুকুমার হৃদয়বৃত্তির হীরক-খণ্ড যেখানে আপন প্রভায় অহরহ প্রদীপ্ত। সে বস্তুর সন্ধানে অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইবে না। তাহার সাক্ষাৎ মিলিবে খাস বক্সা শিবিরেরই অভ্যন্তরে: মিঃ কোটাম বক্সা হইতে বিদায় লইবার পর তথায় কম্যাণ্ডাণ্ট হইয়া আসিলেন লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল হোগান। তাঁহার সামরিক শৌর্য ও উদারতামণ্ডিত উপস্থিতি মিঃ কোটামের পুলিশ-সুলভ অহেতুক পীড়ন-প্রবণতার বিরুদ্ধে যেন এক জীবন্ত প্রতিবাদ। তাঁহার ললাটে ও গণ্ডদেশে ক্ষতচিহ্ন অভ্রান্ত ভাষায় তাঁহার স্বভাব-সুলভ অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দান করে, স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেয় যে, কোন সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য এই ব্যক্তিটির দৃঢ়তা কোটামোচিত কুণ্ঠা ও দ্বিধার দ্বারা কোনদিন আড়ষ্ট ও আচ্ছন্ন হইবার নয়, অপরদিকে তেমনি আবার নির্ভুলভাবে এই আশ্বাস প্রদান করে যে, সামরিক সে দৃঢ়তা ও সঙ্কল্প ক্ষুদ্র প্রতিহিংসা-বৃত্তির দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ক্ষীণ প্রতিশোধ-ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত কোন ক্রমেই অগ্রসর হইবে না। মিঃ হোগান যদিও আসিলেন শান্তি ও প্রীতিপূর্ণ এক নূতন পরিবেশের প্রতিশ্রুতি লইয়া, রাজবন্দিগণ তথাপি তাঁহার দৈনন্দিন আচরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও

তাঁহার আশ্বাসের উপর সহসা আস্থা স্থাপন করিয়া উঠিতে পারিলেন না, কোটামী-আমলের সংগ্রামী মনোভাব পরিহার করিয়া উঠিতে পারিলেন না, ফলে উদার আহ্বানের জবাবে প্রত্যাশিত উদার উত্তর না পাইয়া কর্ণেল হোগান মনে মনে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। অন্য যে কোন ব্যক্তি হইলে এই বেদনাবোধ তাঁহাকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনে উৎসাহিত করিত।

কিন্তু কর্ণেল হোগান তাহা না করিয়া আমাদের অফিস-প্রতিনিধিকে টেবিলের উপর রক্ষিত ফাইলের স্তূপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন ওই যে ফাইলগুলি দেখিতেছেন উহা আপনাদের উপর অবিলম্বে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত নিয়ম ও নির্দেশাবলী; আমি নিজের দায়িত্বে সেগুলি স্থগিত রাখিয়া টেবিলের এক প্রান্তে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছি; আমার সদিচ্ছা ও সম্প্রীতিমূলক মনোভাবের মর্ম উপলব্ধি করিবার পক্ষে আপনাদের অক্ষমতা যে মাঝে মাঝে আমাকে আদেশগুলি আরোপ করিবার জন্য প্ররোচিত না করে তাহা নয়, কিন্তু তথাপি আপনাদের অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই আমি তাহা করিয়া উঠিতে পারি না: যখন দেখিতে পাই, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়ে সমাজ ও পরিবার-জীবনের সর্বপ্রকার সুখ-সম্ভোগ ও আশীর্বাদ হইতে আপনারা বঞ্চিত, তখন মনে হয়, অন্তরে ক্ষোভ ও অবিশ্বাস পোষণ করিবার সমূহ অধিকার আপনাদের আছে এবং যে শাসন-যন্ত্র ও শাসক-জাতি আপনাদের এই পীড়ন ও পেষণের জন্য দায়ী—তাহার অংশ ও অঙ্গ হিসাবে সে ক্ষোভ ও অবিশ্বাসের অধিকাংশ আমার ন্যায্য প্রাপ্য; এই সহানুভূতি ও সমবেদনার ভেষজ-স্পর্শে আন্তরিক আক্রোশের উদ্ধত ও উদ্যত ফণা মুহূর্তে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত পদতলে লুটাইয়া পড়ে।

কর্ণেল হোগেনের কর্মজীবন তাঁহার পারিবারিক-জীবনের রস-

মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া মধুরতর হইয়াছিল। বিপত্নীক কর্ণেল সাহেবের সারা জীবন ছাইয়া, তাঁহার পার্বত্য-বাংলোর সমগ্র ভবন ভরিয়া বিরাজ করিত তাঁহার কন্যার সর্বব্যাপী সত্তা। সুন্দরী ও তরুণী কর্ণেল-দুহিতার আচরণ ও অবয়বে এমন একটা শান্ত ও সংযতভাব প্রকাশ পাইত—যাহা শিক্ষা, সুরুচি ও আভিজাত্য বোধের পরিচয় প্রদান করে; কর্ণেল হোগান কন্যার সস্নেহ সেবা-পরিচর্যা ও সযত্ন অভিভাবকত্বের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন:

রাজবন্দিদের স্থূল আচরণমাত্র নিরীক্ষণ না করিয়া তাহার অন্তরালে নিহিত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা লক্ষ্য করিবার যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, রাজবন্দিদের বুকে কান পাতিয়া তাহাদের হৃৎ-স্পন্দনের ছন্দ উপলব্ধি করিবার মত সংবেদনশীল যে অন্তর— কর্ণেল হোগান তাহা আহরণ করিয়াছিলেন এই আত্মসমর্পণ যোগ হইতে, স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ এই পারিবারিক-পরিবেশ হইতে।

মিঃ কোটাম ও কর্ণেল হোগান একই শাসকগোষ্ঠির সদস্য, একই শাসনযন্ত্রের অংশ, তথাপি একই সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার-বিবেচনাগত পার্থক্য কী অগাধ!

আর একটি স্নেহ-ঘন অন্তরের যে আতপ্ত স্পর্শ লাভ করিবার দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল দৌলতদিয়ায়—আজও তাহার স্মৃতি সমগ্র সকৃতজ্ঞ অন্তর দিয়া স্মরণ করি।

বন্দী-শিবিরের অবরোধ-জীবন হইতে মুক্ত হইয়া অন্তরীন জীবন-যাপনের জন্য বক্‌সা হইতে বদ্‌লি হইলাম ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোয়ালন্দঘাট থানায়। সে থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা মাত্র কিছুদিন পূর্বে চট্টগ্রামের অন্তরীন রাজবন্দী রোহিণী বড়ুয়ার হাতে নিহত হইয়াছেন এবং হত্যাপরাধে-অভিযুক্ত বড়ুয়ার প্রাণদণ্ড-পর্ব সবেমাত্র সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ফরিদপুর আই, বি, আপিসে উপনীত হইয়া সাধারণভাবে জেলার পুলিশ-কর্তাদের ও বিশেষভাবে অন্তরীন স্থান সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম, মেদিনীপুর আইন-অমান্য-আন্দোলনের বিখ্যাত দোহা সাহেব তখন ফরিদপুরের পুলিশ-সুপার এবং তদপেক্ষা অধিকতর কুখ্যাতিসম্পন্ন সন্তোষ গুপ্ত তখন তথাকার গোয়েন্দা-বিভাগের বড় কর্তা ; জেলার পুলিশী-শাসন প্রতিষ্ঠানে এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে ! বলিতে বাধা নাই, সোনা ও সোহাগার যুগপৎ শাসনকালে অন্তরীন-জীবনের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশা ও ভরসা পোষণ করিবার মত বিশেষ কোন উৎসাহ বা উপলক্ষ পাইলাম না ; তাহা ছাড়া, যখন শুনিলাম যে, মুসলমান-প্রধান থানার মুসলমান দারোগা জনৈক হিন্দু-রাজবন্দী কর্তৃক নিহত হইবার পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন যিনি—তিনিও জাতিতে মুসলমান, লীগ-শাসিত বাংলার স্বরূপ স্মরণ করিয়া মনটা তখন একেবারে দমিয়া গেল।

পুলিশ সাহেবের কনফিডেনস্যাল ক্লার্ক মিঃ গ্রোসার গোয়ালন্দঘাট থানার খাদ্য ও আবহাওয়াগত অবস্থার বিবরণ দিতে দিতে কতকটা কৌতুকছলেই বলিয়া উঠিলেন, যান, সেখানে গিয়া সুখেই থাকিবেন, চাই কি কমরেড বড়ুয়া আসিয়া যে-কোন দিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে।

ভদ্রলোকের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর পরিহাস শুনিয়া বেদনায় ও বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলাম : বড়ুয়ার ফাঁসীর মঞ্চের রজ্জুর কম্পন হয়তো তখনও সম্পূর্ণরূপে থামিয়া যায় নাই, এরূপ অবস্থায় তাহাকে লইয়া লঘু হাস্য পরিহাস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবার প্রবৃত্তি মিঃ গ্রোসার সঞ্চয় করিয়া উঠিলেন কেমন করিয়া ! বেশ বিরক্ত ও ব্যথিত কণ্ঠেই বলিলাম, কম্‌রেড বড়ুয়া যদি সত্য সত্যই কোনদিন আসেন, আমি তাঁহার

একতরফা কথা শুনিব না, নিহত দারোগাকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিব।

স্নানাহার সারিয়া অন্তরীন-স্থান অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছি এমন সময় গোয়েন্দা-বিভাগের বড় কর্তা আফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমার ফাইলের উপর চোখ বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, মিঃ বাজপেয়ী. মনে হইতেছে আপনি এখানে আসিবার বহু পূর্ব হইতেই আপনার নামের সহিত আমি পরিচিত ; বলিতে পারেন এইরূপ ধারণার হেতু কি ?

বলিলাম, হেতু একটা অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহা এতদূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে যে, আপনি ঠিক সেটা স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না ; তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য যে ঘটনার বিবরণ প্রদান করিলাম তাহা জীবনে আমার এক বিচিত্র ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ; সে কাহিনী বারান্তরের জন্য স্থগিত রাখিয়া আপাতত আসল ঘটনায় অবতারণা করি !

এক দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে গোয়ালন্দঘাট থানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আরও তিনজন রাজবন্দী সেখানে পূর্ব হইতেই অবস্থান করিতেছেন। দারোগা সাহেব জনাব সামসুদ্দীন চৌধুরী সম্বন্ধে বন্ধুদের অভিমত যাচাই করিতে গিয়া বুঝিলাম, ভদ্রলোক সম্বন্ধে তাঁহারা ভাল ধারণাই পোষণ করেন ; প্রথম পরিচয়ের পর আমিও তাঁহার সম্বন্ধে ভাল ধারণাই গঠন করিলাম, কিন্তু সে ভালোর পরিমাণ যে কতখানি তাহার সঠিক মাত্রা আমি নিজেও সেদিন নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

উপস্থিতির দিনকয়েক পরে আমরা চার বন্ধু একঘরে বসিয়াই প্রাতরাশ করিতেছি—এমন সময়ে দারোগা সাহেব আসিয়া তথায়

দাঁড়াইলেন অত্যন্ত ম্লান, গম্ভীর ও বেদনাক্লিষ্ট মূর্তি লইয়া। প্রাতরাশের অংশ গ্রহণ করিবার জন্ম অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, মাফ করিবেন, খাদ্য গ্রহণ করিবার মত না আছে পেটে ক্ষুধা, না আছে মুখে রুচি এবং মানসিক অবস্থা যে মোটেই তাহার অনুকূল নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। আকস্মিক এই অবস্থান্তরের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আপনারা যদি অগ্রিম প্রতিশ্রুতি দেন যে, অবস্থার প্রতিকার আপনারা করিবেন, তাহা হইলে নালিশ নিবেদন করি।

ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কিছুটা বিস্ময়-মিশ্রিত ব্যগ্রকণ্ঠেই আমি বলিলাম, আপনি হইলেন এই অঞ্চলের সর্বশক্তিমান রাজপুরুষ, আর আমরা আপনারই তত্ত্বাবধানের অধীন অসহায় বন্দীমাত্র, বিপন্ন অবস্থায় প্রতিকার আপনি প্রার্থনা করিতেছেন আমাদের কাছে! উত্তম, অবস্থার প্রতিকার যদি আমাদের সাধ্যায়ত্ত হয় অঙ্গীকার করিতেছি আমরা নিশ্চয় তাহার প্রতিবিধান করিব।

দারোগা সাহেবের মুখ হইতে সে-গাম্ভীর্য ও ম্লানিমার চিহ্ন নিঃশেষে মুছিয়া গেল। হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে তিনি বলিলেন, আমার যে বিপদ তাহার প্রতিকার আপনাদেরই হাতে; এখন নালিশটা নিবেদন করি, শুনুন: গোড়াতেই বলিয়া রাখি, আমি একটু ভোজন-বিলাসী, কাজেই মাহিনা যাহা পাই খোরাকীর খরচ যোগাইবার পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত হয় না বলিয়া মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে কিছু কিছু টাকা আনাইয়া লইতে হয়। গতকাল গৃহিণীর কাছে একটা বিশেষ রকমের খাবার প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব পেশ করিলে গৃহিণী বিরূপ ও বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, বেশ, যখন বলিতেছ খাবার তখন নিশ্চয় তৈয়ারী করিয়া দিব, কিন্তু এই সর্তে যে, তুমি আমাকে তাহা খাইবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতে পারিবে না! এইরূপ অদ্ভুত সর্তের উল্লেখ শুনিয়া তাহার মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া

প্রশ্ন করিলে গৃহিণী তাহার জবাবে আপনাদের কোয়ার্টারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওই যে ওখানে কয়েকটি ভদ্রসন্তান বাস করে উহারা কি খায় তাহার খোঁজ রাখ? এমন কোন অপরাধ যদি তাহারা করিয়াই থাকে—যাহার জন্য এই দণ্ড তাহাদের প্রাপ্য, তথাপি সে অপরাধ তাহারা নিজেদের লাভ ও লোভের জন্য করে নাই, করিয়াছে —তোমার-আমার জন্য, দেশ ও দশের জন্য, অথচ সেই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাহারা জেল খাটিবে, কারা-কষ্টভোগ করিবে, অখাদ্য ও কুখাদ্য খাইয়া কোনক্রমে জীবনধারণ করিবে, আর আমরা ঠায় তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়া উদর-পূর্তি ও রসনা তৃপ্তি করিব এত বড় অনাচার কখনও ধর্মে সহিবে না; তোমার যাহা প্রাণ চায় তুমি সচ্ছন্দে তাহা খাইতে পার; কিন্তু উহাদিগকে অভুক্ত রাখিয়া সুখাদ্য আমার মুখে কিছুতেই উঠিবে না; আমি তাহাদিগকে খাওয়াইতে না পারি, আমার নিজের আহারের আয়োজন কমাইবার অধিকার তো আমার আপন হাতে।

দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়া সমস্যার স্বরূপ অবশ্য উপলব্ধি করিলাম, কিন্তু তাহার সমাধান কিছুটা আন্দাজ করিলেও ঠিক আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারিলাম না। অপূর্ব মহানুভবতা ও আন্তরিক স্নেহ-মমতার সঞ্জীবন-স্পর্শে মনে আমার তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের গভীর মন্থন, শাসন ও সংযমের সকল শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া তাহা চাহিতেছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বাহির হইয়া পড়িতে; কোন প্রকারে বিস্ফোরণোন্মুখ সে ভাবাবেগ চাপিয়া রাখিতে গিয়া মেঘ ও রৌদ্রের বিচিত্র মায়ালোকে সুরু হইয়া গেল হাসি ও অশ্রুর লুকোচুরি খেলা। যথাসম্ভব গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু আপনাদের এই দাম্পত্য-কলহের অবসান ঘটাইবার জন্য আমরা কি করিতে পারি?

আশ্বাস ও ভরসা পাইয়া দারোগা সাহেব সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, আপনারা যদি দয়া করিয়া আহার্যের কিছুটা অংশ গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়, সাপও মরে অথচ লাঠিও ভাঙ্গে না। এই ধরণের উত্তরের আশঙ্কাতেই অন্তর এতক্ষণ আমার উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, পাছে ছিঁচ-কাঁদুনে ছেলের মত চোখের জলের বামাল সহ হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া যাই সেই ভয়ে অন্তরের ও বাহিরের গুরুগম্ভীর অবস্থা যথাসম্ভব লঘু করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, মহাশয়, ভুরী-ভোজনের প্রস্তাবটা বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া অকারণ এতখানি দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করিবার কি প্রয়োজন ছিল! মুখ বদলাইবার লোভনীয় প্রস্তাবে আমরা সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছি। শুভ সংবাদটা গৃহিণীর গোচর করিবার জন্য দারোগা সাহেব দ্রুতপদে গৃহের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মনে হইল, নিঃসন্তান নারীহৃদয়ের চিরবাঞ্ছিত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা যেন আজ সে সংবাদ সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য জীবধাত্রী জগন্মাতার মহিমময়ী মূর্তি ধরিয়া ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন! অন্তর মথিত করিয়া বাহির হইয়া আসিল মাতৃ-বন্দনার পবিত্র ঋক্ :

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতাঃ
নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমো নমঃ

পনের

রূপমুগ্ধ পতঙ্গ

দীর্ঘদিন জেল-ভোগের পর অন্তরীনে আবদ্ধ হওয়া সরকারী-কর্মচারিদের অবসর গ্রহণ করিবার পূর্বে ছুটী লওয়ার সামিল : পরিপূর্ণ মুক্তির দিন ঠিক দৃষ্টিগোচর না হইলেও, তাহার আসন্ন আবির্ভাব আভাসে অনুভবগম্য হয়; উট যেমন মরুপথে চলিতে চলিতে নাক উঁচু করিয়া অদূরবর্ত্তী জলাশয়ের আঘ্রাণ লইতে চেষ্টা করে, অন্তরীনাবদ্ধ বন্দীর মনও তেমনি মাঝে মাঝে উদ্‌গ্রীব হইয়া নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হয়—সেখান হইতে সমাজ ও পরিবার-জীবন আর কতদূর! আমারও জীবন-নাটকের যে একটা অতীত অঙ্ক আছে, সে অঙ্কে সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও বিরহ-মিলনের বিচিত্র অভিনয়ের একটা কাহিনী আছে, বক্‌সার বন্দী-জীবনে সে কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম; লোকালয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত এই বন্দীশালায় বিস্মৃতপ্রায় সে জগতের আভাস মাঝে মাঝে বহন করিয়া আনিত সমাজ ও পরিবার-জীবন হইতে প্রেরিত কচিৎ কোন পত্র; উদার ও উদাসীন চিৎ-সমুদ্রের উপরিভাগে পত্র নিক্ষেপের ফলে যে ক্ষীণ চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিত—তাহা নিঃশেষে বিলীন হইয়া যাইতে বিশেষ বিলম্ব হইত না, তাহার পর বহুদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিতাম আমি এবং আমার সম্মুখে প্রসারিত রহিত অনির্দিষ্ট মেয়াদী বন্দী-জীবনের অন্তহীন পথ। অন্তরীনে আসিয়া মন সেই নিশ্চিন্ত ও নির্বিকল্প ভাব-সমাধি হইতে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল, অনুভব করিতে লাগিল—তাহার চতুর্দিকে প্রসারিত সমাজ ও পরিবার-জীবনের সেই বিচিত্র প্রাণস্পন্দন—যাহার সুর ও ছন্দের সহিত সে সঙ্গতি হারাইয়া ফেলিয়াছে কোন

অতীতে। সমাজ ও পরিবার-জীবনের খরস্রোতা প্রবাহিনীর কূলে দাঁড়াইয়া নীরবে প্রত্যক্ষ করিতাম তাহার চঞ্চল ও বিচিত্র গতিভঙ্গী। দেখিতে দেখিতে মনের গভীরে কচিৎ গুঞ্জরিয়া উঠিত ভুলিয়া-যাওয়া এক-আধটি গানের কলি, হারাইয়া-যাওয়া এক-আধটু সুরের রেশ।

দৌলতদিয়া গ্রামটী আমার ভালই লাগিল : তাহার চারিদিকে আস্তৃত দিগন্তপ্রসারী মাঠ, মাঠের মাঝে মাঝে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, তাহারই কোলে কোলে ছোট ছোট গ্রাম ; দেখিতে দেখিতে মনে হইত উহা যেন বাস্তব দৃশ্য নয়, বিস্তীর্ণ এক ক্যানভাসের গাত্রে সুদক্ষ কোন এক শিল্পীর অঙ্কিত উহা যেন এক সুদৃশ্য চিত্রপট। একদা এক অপরাহ্ণ বেলায় অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া গ্রামের প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় প্রমথবাবু আসিয়া পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন। প্রমথবাবু অবসরপ্রাপ্ত এক পুলিশ-সাবইনস্পেক্টার ; যতদূর মনে পড়ে তাঁহার নিজ গ্রাম ঢাকা জেলায়, ঢাকা সহরে তাঁহার একটি সিনেমা-গৃহ ছিল ; কিন্তু গ্রামের বাড়ী ও বিষয়-সম্পত্তি প্রথম পক্ষের ছেলেদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া দৌলতদিয়া গ্রামে আসিয়া একটি বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন এবং সম্ভবত তৃতীয়পক্ষের পত্নীসহ তথায় অখণ্ড অবসরজীবন যাপন করিতেছেন। প্রমথবাবু দূরে মাঠের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওই যে ওখানে একটি বটগাছ দেখিতেছেন—ওই স্থানটি প্রবাদবিদিত এক শোচনীয় দুর্ঘটনার অকুস্থলরূপে পরিচিত। আজ যেখানে গ্রাম ও মাঠ জাগিয়া উঠিয়াছে তখন সেস্থান দিয়া পদ্মানদী প্রবাহিত ছিল ; একদিন এমনি এক অপরাহ্ণ-বেলায় বরযাত্রী ও নববিবাহিত বর-বধূসহ একখানি নৌকা ওই স্থানটিতে নিমজ্জিত হয় ; গ্রামবাসিগণ কূলে দাঁড়াইয়া মর্মান্তিক সে দৃশ্য দেখে, তাহাদের অসহায় আর্ত-হাহাকার শুনে, কিন্তু সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইবার পূর্বেই তাহাদের জীবননাটকের

যবনিকাপাত হয়। প্রমথবাবু স্তব্ধ হইলেন, শান্ত আমার চিৎ-সমুদ্রের যে আলোড়ন তুলিয়া দিলেন তাহা কিন্তু সহসা থামিতে চাহিল না : দৃষ্টি তাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেত অনুসরণ করিয়া ভাসিয়া চলিল দূরবর্তী বটবৃক্ষের দিকে। মন কালসমুদ্র সন্তরণ করিয়া ছুটিল নিদারুণ দুর্ঘটনার সেই অভিশপ্ত ক্ষণটির অভিমুখে। পদ্মার জল-তরঙ্গের সহিত তাল রাখিয়া হয়তো নৌকায় সেই মুহূর্তে শানাই-এ বাজিয়া উঠিয়াছিল ভাটীয়ালী সুর। হয়তো চারিটি চোখের আগ্রহ-ব্যাকুল লাজ-নম্র-দৃষ্টি—আর সকল দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া অপরাহ্ণ-বেলার গোধূলি-আলোকে খেলিতেছিল পরস্পরের সহিত ক্ষণে মিলিত হইয়া ক্ষণে মুদিত হইবার লুকোচুরি খেলা, হেনকালে অকস্মাৎ বোধন বাঁশীতে বাজিয়া উঠিল বিদায়ের বেদন-রাগিণী, মিলন-পিয়াসী যে চারিটি চোখের চটুল দৃষ্টি পুনর্বার মিলিত হইবার পূর্বেই মধ্যপথে পদ্মার বুকে অস্তমিত হইল, মনে হইল তাহারাই বুঝি সন্ধ্যা তারকারূপে আকাশে উদিত হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিয়া আজও প্রদীপ্ত রহিয়াছে !

ভরা-ডুবীর করুণ কাহিনী শুনিবার জন্য এই অবেলায় নির্জন গ্রাম-প্রান্তে আসিয়া একাকী আসন গ্রহণ করি নাই ; মনটা কেমন যেন বিষাদ-ব্যথায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল ; কিন্তু সেদিনও আমি অনুমান করিতে পারি নাই যে, ব্যর্থ জীবনের এক করুণতর জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রমথ বাবু আমার জন্য তাঁহার তূণে গচ্ছিত রাখিয়াছেন। প্রমথবাবু একদিন সকালে আমার ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার চাকর 'মাজীর' পরোয়ানাসহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে আহ্বানে যত সত্বর সম্ভব সাড়া দিবার সম্মতি জানাইয়া চাকরটিকে বিদায় দিবার পর প্রমথবাবু বলিলেন, দেখুন মশাই, আমার এই চাকরটিকে লইয়া আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি ; লোক হিসাবে সে অত্যন্ত ভাল এবং সাধু

প্রকৃতির ; খুবই খাটিয়ে লোক, গুণও আছে অনেক, কিন্তু তাহার চরিত্রে প্রধান দোষ হইল এই যে, সে বিষম খামখেয়ালী ; তবে মন্দের ভালো যে, সে-খেয়াল সব সময়ে তাহার ঘাড়ে চাপিয়া থাকে না, প্রতি মাসে তিন চার দিন সে খেয়াল আসিয়া তাহার ঘাড়ে ভর করে ; অন্তত সে কয়দিন তাহাকে দিয়া কোন কাজ করানো সম্ভব হয় না। চাকর-চরিত কথার এই পর্যন্ত শুনিয়া আমার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সাগ্রহে প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে-কয়দিন সে কি করে ? প্রমথবাবু নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, করে আমার মাথা আর তাহার গুষ্টির মুণ্ড : কোথা হইতে রাজ্যের ফুল জুটাইয়া আনিয়া সেই যে ঘরে সে খিল বন্ধ করে ঘাড়ের ভূত না-নামা পর্যন্ত সে ঘর হইতে বাহির হয় না। কাহারও সহিত কথা কয় না, অন্য কাজকর্ম করা দূরে থাক, দুবেলা দুমুঠো খাইয়া আমাকে কৃতার্থ পর্যন্ত করে না।

অদ্ভুত খেয়াল বলিতে হইবে, তদপেক্ষা অদ্ভুত-খেয়ালী সেই ভূত— যাহার প্রভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া সে খাম-খেয়ালের এই অদ্ভূত খেলায় মত্ত রহিয়াছে ! প্রমথবাবুকে বলিলাম, আপনার চাকর আমার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছে, কাজেই তাহার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে চিন্তা-চর্চা না করিয়া আমি পারিব না।

একদিন মধ্যাহ্নের আহার শেষে আমার নির্জন কুটিরে একেলা বসিয়া আছি, দেখি প্রমথবাবুর হিন্দুস্থানী সেই ছোকরা-চাকরটি পথ দিয়া যাইতেছে ; তাহাকে ডাকিয়া বসাইলাম এবং মুলুকের ও মা-বাপের প্রসঙ্গ তুলিয়া আলাপ জমাইতে চেষ্টা করিলাম। ঘরোয়া-আলাপ যখন বেশ একটু ঘন হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, ধীরে ধীরে কাজের কথাটা পাড়িয়া বসিলাম : প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া যাহা প্রকাশ পাইল তাহার সারমর্ম এই যে, প্রতি মাসে নির্দিষ্ট

দিনে তাহার সমুখে তিন জন দেবীর আবির্ভাব হয় এবং তাঁহারা অবস্থান করেন তিন দিনের জন্য। দেবীত্রয়ের মধ্যে মধ্যমাই বস্তুত আসেন প্রধানা অতিথিরূপে, অপর দুইজন সে-অনুষ্ঠানে তাঁহার সহযাত্রী মাত্র, নিছক নীরব উপস্থিতির দ্বারা তাঁহারা পূজামণ্ডপের শোভা বর্ধন করিয়া থাকেন। মধ্যমাদেবী আসিয়া তাহার নিকট দাবী করেন ফুলের, তাই বন-জঙ্গল পথ-ঘাট ও বাগ-বাগিচা খুঁজিয়া তাহাকে সেই সব ফুলই আহরণ করিয়া আনিতে হয়, দেবীর দৃষ্টিতে যাহা কাম্য ও রম্যরূপে বিবেচিত। দেবী যতক্ষণ আসনে অধিষ্ঠিতা—পূজা-অর্চনা পরিহার করিয়া নিত্যকর্মে নিযুক্ত হওয়া কি তাহার পক্ষে সম্ভব!

অপূর্ব পূজা-পদ্ধতি, অদ্ভুত দেবী-উপাখ্যান। প্রমথবাবুর নিকট হইতে রহস্যের আভাস লাভ করা অবধি সে সম্বন্ধে কৌতূহল আমার জাগ্রত হইয়াই ছিল, এখন ভক্তের নিজ মুখ হইতে নিঃসৃত বিবরণ সে রহস্যকে ঘনতর, সে আগ্রহকে আকুলতর করিয়া তুলল; ভাবিতে লাগিলাম, এ তত্ত্বের অবশ্যই তল আছে, এ রহস্যের নিশ্চয়ই মূল আছে, কিন্তু তাহা কোথায়! লোকটির ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ও পূর্ববর্তী চাকরি-জীবন সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইতে গিয়া সবিস্ময়ে এমন এক বিচিত্র ঘটনার সহিত আমাকে সহসা মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইতে হইল—যাহা আভাসে রহস্যের উৎসমূলের উদ্দেশ বলিয়া দেয় এবং ইঙ্গিতে জানাইয়া দেয়—দুর্বোধ্য দেবীতত্ত্বের তল কোথায়!

লোকটি ইতিপূর্বে চাকরি করিত এই থানারই এক দারোগার বাড়ীতে। তিনি এই থানা হইতে অন্যত্র বদলি হইলে চাকরটিও তাঁহাদের সহিত তথায় গমন করে। তিনটি মাত্র কন্যা ও পত্নী লইয়া উক্ত দারোগার পরিবার গঠিত এবং সে-অঞ্চলে সুন্দরী হিসাবে দারোগা-দুহিতাত্রয়ের সবিশেষ খ্যাতি ছিল, বিশেষ

করিয়া মধ্যমা কন্তার রূপের কাহিনী—একরূপ প্রবাদবিদিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দারোগার রূপ-লাবণ্যময়ী তিনটি দুহিতা এবং দেবীরাও সংখ্যায় তিনজন; এতদুভয়ের মধ্যে সংখ্যাগত যে সঙ্গতি, সৌন্দর্যগত যে সামঞ্জস্য—তাহা কি নিছক আকস্মিক দৈব-দুর্ঘটনা, অথবা তাহাদের মধ্যে কার্যকারণগত সম্পর্কের কোন সূত্র রহিয়াছে! সংশয়াম্বিত এই প্রশ্নের দ্বারা পীড়িত হইয়া আর একদিন ভৃত্যটিকে লইয়া একান্তে বসিলাম এবং তাহার প্রাক্তন প্রভুর প্রসঙ্গ তুলিয়া জানিতে চাহিলাম—তাঁহার পরিবারে লোক-সংখ্যা কয়জন, লোক হিসাবে কে কিরূপ, কাহার নিকট হইতে সে কেমন ব্যবহার পাইত এবং তাহাকে কাজ করিতে হইত কি কি! সওয়াল-জবাবের সময় লক্ষ্য করিলাম, যখনই দারোগার মধ্যমা দুহিতার প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িতেছি—চাকরটি তখনই ঢোক গিলিয়া কি যেন চাপিতে চাহিতেছে। কোথা হইতে উচ্ছ্বসিত শোণিত-স্রোত ছুটিয়া আসিয়া তাহার সারা মুখখানি ছাইয়া ফেলিতেছে। আমার প্রশ্নের জবাবে চাকরটি স্বীকার করিল, সে ও মেজ দিদিমণি অবসর সময়ে একত্রে ফুলের বাগান তৈয়ারী করিত, মালঞ্চ ফুলে ভরিয়া উঠিলে একসাথে পুষ্পচয়ন করিত এবং ফুল তোলা শেষ হইলে স্তবকে ও মাল্যে গ্রথিত হইয়া তাহা শোভা পাইত মেজ দিদিমণির পুষ্প-পাত্রে। ফুল যদিও দিদিমণিরা ভালবাসিতেন সকলেই তথাপি ফুলের উপর বিশেষ দাবী ছিল মেজ দিদিমণিরই, কাজেই সে চাহিদা তাহাকে মিটাইতে হইত সর্বাগ্রে। আজ আর সে দিদিমণি নাই, ফুল-বাগিচা নাই, ফুল তোলা, মালা গাঁথা ও তোড়া বাঁধার সে দ্বৈত-লীলা নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ফুলের চাহিদা আজও মিটিয়া যায় নাই: সেদিন রূপ-মুগ্ধ পুরুষের নিকট হইতে দারোগার মধ্যমা কন্তা যে ফুল গ্রহণ করিত সৌন্দর্যের রাজকররূপে, দুর্লভ দেবিত্বের পর্যায়ে উন্নীত হইয়া তিনিই

আজ ভক্ত ও অনুরক্তের নিকট হইতে সেই ফুলই গ্রহণ করিতেছেন পূজার অঞ্জলিরূপে। দারোগা-দুহিতাদের জীবন-ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে ভৃত্যের অস্তিত্ব ও ভক্তের স্মৃতিচিহ্ন হয়তো নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে; কিন্তু রূপ-মুগ্ধ পতঙ্গ একদা কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে লাবণ্যের যে হোম-বহ্নিতে আপনাকে আহুতি দিয়াছিল—তাহার দীপ্তি দৃষ্টির সমুখ হইতে সুদূরে সরিয়া গেলেও, তাহার দাহ কিন্তু আজও জুড়াইল না, ইহজীবনে কোনদিন জুড়াইবে কি না কে জানে!

ফাগুনের ফুলের ফসল নিঃশেষে ফুরাইয়া গেলেও ক্ষণিকের ভুলের মাশুল হতভাগ্য বেচারীকে আজও গুণিতে হইতেছে—হয়তো বা তাহা গুণিতে হইবে আজীবন!

ষোল

ডাইনীর হাতে পো

রূপ-মুগ্ধ পতঙ্গের আত্মাহুতি নিছক কাব্যের উপমা মাত্র নয়, তাহার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, দৌলতদিয়াতে অবস্থানকালেই। সেদিন সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর বিকালের দিকে সবে মাত্র বৃষ্টি থামিয়াছে। সারাটা দিন নির্জন কুটিরে অবরুদ্ধ থাকিয়া প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে; মনে হইতেছে, সঙ্কীর্ণ কুটিরের কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া অন্তত কিছুক্ষণের জন্য যদি গ্রামের পথে প্রান্তরে বাহির হইতে না পারি, কুটীরের বদ্ধ বায়ু হইতে হয়তো আর অধিকক্ষণ পরমায়ু আহরণ করিতে পারিব না। বৃষ্টির প্রসঙ্গ যখন আসিয়া পড়িল, দৌলতদিয়ায় বর্ষার দুর্ভোগের কিছুটা বিবরণ দিয়া

রাখি : চারিধারে একটি মাত্র চাটাইয়ের বেড়া দিয়া ঘেরা আমাদের কুটিরের মাথার উপর টিনের চাল এবং নিম্নে মেজের মাটি তখনও কাঁচা ও থস্‌থসে। বর্ষার এক সন্ধ্যায় চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া পাঠে নিবিষ্ট আছি। হঠাৎ মনে হইল চেয়ারখানা যেন নড়িতেছে; ভাবিলাম, ভূমিকম্প নয় তো! কিন্তু কই, ভূমিকম্পের কোন লক্ষণ তো কোথাও দেখা যাইতেছে না! তবে চেয়ারখানা হঠাৎ নড়িয়া উঠিল কি কারণে, তবে কি কম্পনের পশ্চাতে অনৈসর্গিক অন্য কোন কারণ ক্রিয়ারত রহিয়াছে, তবে কি চেয়ার ও টেবিল আমার সত্যসত্যই ভূতগ্রস্ত?

দৌলতদিয়ায় প্রথম যেদিন আসি দারোগা সাহেব টেবিল ও চেয়ারখানা দেখাইয়া তাহার ইতিহাস বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিলেন, দেখুন, থানার প্রাক্তন দারোগা সাহেব এই টেবিল এবং চেয়ারে বসিয়া কাজ করিবার কালেই রাজবন্দী রোহিণী বড়ুয়া কর্তৃক নিহত হন। দায়ের আঘাতে কর্তিত স্কন্ধ হইতে তাঁহার মাথা টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে এবং তাঁহার প্রাণহীন দেহ লুটাইয়া পড়ে রক্ত-প্লাবিত এই টেবিলেরই উপর। তদবধি অভিশপ্ত এই টেবিল অব্যবহার্য অবস্থায় থানার এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে, অন্য কেহ যাহা ব্যবহার করে নাই, আপনার উপরে আমি তাহা আরোপ করিতে চাইনা, তবে যদি স্বেচ্ছায় আপনি তাহা ব্যবহার করিতে মনস্থ করেন তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা! লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, হত্যাকাণ্ডের পর টেবিল ও চেয়ার যদিও বার্নিশ করা হইয়াছে তথাপি বার্নিশ ভেদ করিয়া জমাট-বাঁধা রক্তের চাপ তখনও স্থানে স্থানে সুস্পষ্ট; আগ্রহের সহিত বলিলাম, শবসাধনার সিদ্ধপীঠ-স্বরূপ এই টেবিল ও চেয়ারই আমি ব্যবহার করিব। সেদিন বৈপ্লবিক দুঃসাহস দেখাইবার জন্য একথা বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু টেবিলের কাঁপন

দেখিয়া ও কট্‌কট্‌ আওয়াজ শুনিয়া মনে সংশয় সঞ্জাত না হইয়া পারিল না: বর্ষণ-মুখর এই বাদল সন্ধ্যায় নিহত দারোগা সাহেবের প্রেতাত্মা আসিয়া টেবিলের উপর ভর করে নাই তো! লণ্ঠন লইয়া টেবিলের তলদেশ নিরীক্ষণ করিতে গিয়া দেখি থস্‌থসে কাঁচা মাটি দিয়া গড়া মেঝের কাদায় টেবিলের একটি পায়ার প্রায় আধখানা পুতিয়া গিয়াছে। পায়ার যে আধখানা মাটির উপর জাগিয়া রহিয়াছে তাহারই গায়ে একটা মোটা দড়ি জড়াইলাম এবং চারজনে মিলিয়া প্রাণপণ জোরে তাহা টানিতে টানিতে চেয়ারের প্রোথিত পায়া সশব্দে মেজের ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনিলাম। বর্ষার দুর্ভোগ আমরা চারজনে সম্মিলিতভাবে সহ্য করিতাম এবং সমবেতভাবে তাহা কাটাইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতাম: বর্ষার গভীর রাত্রে হয়তো বাদল নামিল। চাটাইয়ের ছিদ্র-পথ দিয়া বৃষ্টির অজস্র ধারা প্রবেশ করিতে লাগিল কুটিরের মধ্যে; দেখিতে দেখিতে ঘরের মেঝেয় জল জমিয়া উঠিয়া তরঙ্গে তাহা হিল্লোলিত হইয়া উঠিল এবং কুটিরের কোণে কোণে আরম্ভ হইয়া গেল দাদুরীর মত্ত কোলাহল; তক্তপোষের উপর বিছানা স্তূপীকৃত করিয়া তাহারই চূড়ায় আসন লইলাম এবং বৃষ্টি বন্ধ হইবার প্রতীক্ষায় প্রহর গণিতে লাগিলাম ঢেউয়ের খেলা দেখিয়া ও ভেকের খেয়াল গান শুনিয়া। অবশেষে বৃষ্টি থামিল, তখন চার বন্ধুই থালা ও গেলাস লইয়া নামিয়া পড়িলাম জল ছেঁচিবার জন্য; সমবায় প্রথায় চারিটি ঘরের জল ছেঁচা শেষ হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া আমরা যখন শয্যা গ্রহণ করিতে গেলাম পূব আকাশে তখন প্রায় সুরু হইয়া গিয়াছে উদয়-উষার লোহিত রাগের অনুরঞ্জন।

কথায় কথায় আসল কথা হইতে বহুদূর সরিয়া আসিয়াছি: সেদিন অপরাহ্নে ঝিওরবাজার স্টেশনের নিকট দিয়া যখন বেড়াইতে চলিয়াছি

সারাদিন অদৃশ্য রহিবার পর বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে সূর্য সবেমাত্র তখন ছিন্ন মেঘের ছিদ্রপথে উঁকি দিতেছে। সহসা পাখীর উচ্চ চিৎকারে চকিত হইয়া সম্মুখস্থ পাটগুদামের দিকে চাহিয়া দেখি, দারুণ কলরবে চিম্‌নি বেড়িয়া তাহারা উড়িয়া ফিরিতেছে। হেতু নির্ধারণ করিতে না পারিয়া যেই আরও একটু নিকটস্থ হইয়াছি, অমনি চোখে পড়িল চিম্‌নি-গাত্রে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড। বহ্নি-রহস্য বুঝিতে বিলম্ব হইল না : অস্তোন্মুখ সূর্যের রক্তিম আভা চিম্‌নী-গাত্রস্থ কাঁচখণ্ডে প্রতিফলিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে বহ্নিকুণ্ডরূপে ; রূপমুগ্ধ পতঙ্গের দল যখন সেই সৌন্দর্যের হোম-বহ্নিতে আত্মাহুতি দিবার আগ্রহে কাঁচখণ্ডের পাত্রে বৃথাই মাথা ঠুকিয়া মরিতেছে, পাখীরা তখন পরমানন্দে ভোজ জমাইয়াছে রূপমুগ্ধ পতঙ্গদিগকে উদরসাৎ করিয়া : মায়াবহ্নিকে বেষ্টন করিয়া উড়িতেছে পতঙ্গদল, পতঙ্গকুলকে পরিক্রমা করিয়া পাখা মেলিয়াছে বিহঙ্গরাজি—রূপের পশ্চাতে ছুটিয়াছে জীবন, জীবনের পিছনে চলিয়াছে মৃত্যুর হত্যা অভিযান।

চোখের সম্মুখে যখন দেখিতেছি, প্রেম বৃথাই মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে রূপের পায়ে, রূপ দেহের পসরা সাজাইয়া ছদ্মপ্রেমের বিকি-কিনি করিতেছে, ঠিক এমনই সময় দারোগা সাহেব একদিন বৈঠকী গল্প প্রসঙ্গে শোনাইলেন, লায়লা ও মজনুর প্রেমমুগ্ধ জীবনের একটি অপূর্ব কাহিনী। বিশুষ্ক জীবন-মরুর শতদীর্ণ মৃত্তিকার বুকে সে কাহিনী আনন্দের রস-সিঞ্চন করিল, সঙ্গে সঙ্গে সে কাহিনীকে আমি রূপদান করিলাম, কাব্যে। কবিতা শুনিয়া দারোগা সাহেব উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, সে আনন্দের অংশ পরিবেশন করিবার জন্য ডাকিয়া আনিলেন গ্রামের পরিচিত প্রতিটি ভদ্রলোককে ; দেখিতে দেখিতে দশমুখে কবিতার খ্যাতি দশদিকে রটিয়া গেল, কাব্যের ছন্দ-ঝঙ্কার সদরে পৌঁছাইতেও বিলম্ব হইল

না : ফলে স্বয়ং দোহা সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই দৌলতদিয়ায় আসিতে লাগিলেন—'মাতোয়ালা মজনুর' আবৃত্তি শুনিবার জন্য। আমার কাব্যের খ্যাতি ক্রমে গোয়েন্দা-দপ্তরেও পৌঁছাইল এবং তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিলেন তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে : অন্তরীনেও আমার লেখনী চলিতেছে ইহাই তাঁহাদের নিকট চরম কথা, তাহা কোন্ পথে চলিতেছে সে প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অবান্তর। আজ যাহা প্রেমের চর্চায় নিযুক্ত কাল যে তাহা অন্য আলোচনার আশ্রয় গ্রহণ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে! সুতরাং গোয়েন্দাবিভাগ মনস্থ করিলেন, খাতা-পত্র আমার যাহা কিছু আছে এই বেলা হস্তগত করিতে হইবে।

বিশ্বস্তসূত্রে সে সিদ্ধান্তের আভাস পাইলাম এবং মনে মনে চিন্তিত হইয়া উঠিলাম—আমার রচনাগুলির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। বক্সা বন্দী শিবির হইতে লেখাগুলি বাহির করিয়া আনিতে যে বেগ পাইতে হইয়াছিল—মনে পড়িয়া গেল তাহারই বেদনাদায়ক স্মৃতি : অন্তরীনে আসিবার জন্য ক্যাম্পের আফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলে, কম্যাণ্ডাণ্টের ব্যক্তিগত সহকারী নৃপেনবাবু বাক্স ও বিছানাপত্র তল্লাসী করিতে লাগিয়া গেলেন এবং নিপুণহস্তে খাতা-পত্রগুলি খুঁজিয়া বাহির করিয়া বেশ বড় রকমের একটি পুলিন্দা বাঁধিলেন। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে নৃপেনবাবু জবাবে জানাইলেন খাতাগুলি পরীক্ষার নিমিত্ত কলিকাতার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা-বিভাগে যাইবে এবং পরীক্ষান্তে তাহা যদি নির্দোষ ও প্রত্যর্পণযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়—তাহা হইলে সেগুলি আমি ফিরিয়া পাইতে পারিব।

প্রমাদ গণিয়া আমি কমাণ্ডাণ্টের দর্শনপ্রার্থী হইলাম এবং নৃপেনবাবুর প্রেরিত বার্তা পাইয়া তিনি অবিলম্বে আফিসে আসিয়া উপনীত হইলেন। সাহেবের নাম ভুলিয়া গিয়াছি, শুধু এইটুকু মনে আছে যে, সদ্য আই.

সি, এস, পাশ করা তিনি এক আইরিশ যুবক। ঘটনার বিবরণ শুনিতে শুনিতে পুলিন্দা খুলিয়া বইগুলি তিনি দেখিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে যে বইখানির উপর প্রথমেই তাঁহার হাত পড়িল—আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় কবি জর্জ রাসেলের (ছদ্মনাম এ, ই,) তাহা একখানি কাব্যগ্রন্থ। সাহেব সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, এ, ই, আপনি পড়েন দেখিতেছি!

বলিলাম, শুধু পড়ি না সাহেব, বাংলায় তাঁহার কবিতার তর্জমাও করি, এই বলিয়া রাসেলের আরও দুই-একখানি বই ও তৎসহ অনুবাদের খাতাখানা সাহেবের হাতে দিয়া বলিলাম, দীর্ঘ চার বৎসরব্যাপী বক্সার বন্দী-জীবনের শ্রম ও সাধনার ইহাই আমার মোট সঞ্চয়; নৃপেনবাবু এই সঞ্চয় হইতে আমাকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন: হাঁ; বঞ্চিত করা ছাড়া তাঁহার এই কার্যকে আর কি বলিব! তিনি একথা ভালভাবেই জানেন যে, খাতাগুলি গোয়েন্দা-বিভাগে প্রেরিত হইলে গুণাগুণ বিচার না করিয়াই তাঁহারা সেগুলি বাজেয়াপ্ত করিবেন এই যুক্তিতে যে, যেহেতু তাহাদের রচয়িতা একজন রাজবন্দী, অতএব তাহা আপত্তিজনক ও আটক হইবার যোগ্য। আপনাদের গোয়েন্দা-বিভাগ আমাদের বিরুদ্ধে বহু জঘন্য অভিযোগ আনয়ন করিয়া জঘন্যতর আরও বহু অপবাদ রটনা করিয়া এই কথাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, আমরা দস্যু ও নরহন্তা ছাড়া আর কিছু নই। আমাদের সৃষ্ট এই সাহিত্য ও কাব্য সে অপবাদের বিরুদ্ধে জাগ্রত প্রতিবাদ জানাইয়া জন-সমাজকে বলিবে, গোয়েন্দা-বিভাগের অভিযোগ যদি সত্যও হয়, আমাদের চরিত্রের উহাই সমগ্র দিক নয়, উহা ছাড়াও আর একটা দিক আছে এবং তাহা হইল এই—সাহিত্য ও কাব্য সাধনার দিক, রস ও সৌন্দর্য সৃষ্টির দিক। আমার যথাসর্বস্ব এই সঞ্চয় হইতে আপনি কি আমাকে বঞ্চিত করিতে চান? সরকারী আদালতের সমক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ বৃটিশ

গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে দেয় নাই, জনমতের দরবারে দর্শাইবার যোগ্য এই একমাত্র অনুকূল যুক্তি কি আপনি অপহরণ করিতে চান ?

বাংলার বিপ্লবী-বন্দীর-দপ্তরে রাসেলের গ্রন্থ, তাহার খাতায় রাসেলের কাব্যানুবাদ ইতিপূর্বেই আইরিস যুবকের জাতীয় ভাবাবেগকে স্পর্শ করিয়াছে। কাজেই আমার উচ্ছ্বসিত ভাষণ অতি সহজে অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইল : রচনার অক্ষুণ্ণ সঞ্চয় সঙ্গে লইয়াই আমি দৌলতদিয়ায় আসিলাম। এত শ্রম ও সাধনার সঞ্চয় কি আমাকে শেষ পর্যন্ত ফরিদপুর গোয়েন্দা-দপ্তরের গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে হইবে ? সে সঙ্কট আমি কাটাইয়া উঠিলাম দারোগা সাহেবের সহৃদয় সাহায্য ও সহযোগিতার গুণে ; তিনি হস্তক্ষেপ না করিলে, আইরিশ যুবকের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত না হইলে আমার 'প্রতিধ্বনি' নামক অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ হয়তো দিবা-লোকের মুখ দেখিতে পাইত না। একদিন রাত্রির ট্রেনে দারোগা সাহেব কলিকাতা রওয়ানা হইবেন শুনিয়া তাঁহাকে সন্ধ্যাবেলায় আমার ঘরে ডাকিয়া আনিলাম এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া গোপন কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দারোগা সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কি মশাই, খুন-টুন করিবার মতলব আছে নাকি ? হাসিয়া বলিলাম, একটা দারোগা যখন খুন হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে আর একটা হইবে—তাহা আর বিচিত্র কি ! এখন কাজের কথা বলি, শুনুন ! লোক মুখে শুনিতেছি, গোয়েন্দা-বিভাগ আমার বাক্স-প্যাটরা তল্লাসী করিয়া খাতাপত্র হস্তগত করিতে মনস্থ করিয়াছে ; বিশাল সাগর পাড়ি দিয়া কাব্যের পসরা আমার কিনারায় আসিয়া ভরা-ডুবি হোক—ইহাই কি আপনি কামনা করেন ? স্মরণ রাখিবেন, তাহা যদি হয়—আপনার সাধের কবিতা 'মাতোয়ালা মজনুও' সে সলিল-সমাধি হইতে রক্ষা পাইবে না। দারোগা সাহেব বেদনা-মিশ্রিত আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমি

এ ব্যাপারে কি করিতে পারি? প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে আমি বলিলাম, খাতা-পত্র বাণ্ডিল বাঁধিয়াই রাখিয়াছি, আপনি সঙ্গে করিয়া তাহা কলিকাতা লইয়া গিয়া, যতদিন না মুক্ত হইয়া গৃহে ফিরি—ততদিনের জন্য নির্ভরযোগ্য কোন স্থানে তাহা গচ্ছিত রাখিতে পারেন। বাড়ী হইতে কলিকাতায় আপনার নিকট লোক পাঠাইব, আপনার নামীয় চিঠিতে আপনার নামের পশ্চাতে যদি D^2 E এই শব্দটী থাকে, তাহা হইলে পত্রবাহকের হাতে গচ্ছিত জিনিষ আপনি স্বচ্ছন্দে প্রত্যর্পণ করিতে পারেন। দারোগা সাহেব কপালে চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু D E নামক ওই বস্তুটি কি? হাসিয়া বলিলাম, আপনি ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব একস্‌পার্ট কিনা তাই আপনার পদের উহা সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, দারোগা সাহেব ছিলেন বোবা কালার নীরব ভাষার বিশেষজ্ঞ; বাংলার যে কোন আদালতে মামলাসূত্রে যখনই কোন বোবা-কালা সাক্ষীর সাক্ষ্য লইবার প্রয়োজন হইত, সে কাযের জন্য ডাক পড়িত এই লোকটির। দারোগা সাহেবকে বোবা-কালার সহিত আলাপ করিতে দেখিয়াছি এবং দেখিয়াছি, কত সহজে ও সচ্ছন্দে তিনি আপনাকে তাহাদের স্বজন করিয়া লইতে পারেন। সেদিন সন্ধ্যায় আমার দীর্ঘ জেল-জীবনের সুকঠোর শ্রম ও সাধনার যাহা কিছু সৃষ্টি ও সঞ্চয় রুদ্ধকক্ষের সাক্ষীহীন নির্জনতায় আমি নিঃশেষে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম; উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্যের বিপুল আয়োজন সম্মুখে স্তরে স্তরে সাজাইয়া দিয়া যিনি ভক্ষক তাঁহাকেই নিযুক্ত করিলাম তাহার বিশ্বস্ততম রক্ষকরূপে। গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা সন্তোষ গুপ্ত মহাশয় যখন তাঁহার পরিকল্পিত তল্লাসীর গুপ্ত-অভিযানের ভাবী সাফল্যের স্বপ্ন দেখিয়া মনে মনে আত্মসন্তোষ সম্ভোগ করিতেছেন, বামাল তখন পুলিশ প্রহরীর নিরাপদ রক্ষণাধীনে কলিকাতা অভিমুখে পাড়ি জমাইয়াছে।

কাব্য-বাসর

হঠাৎ একদা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে স্বগৃহে অন্তরীনের আদেশ আসিয়া পড়িল; সে সংবাদ গ্রামময় রটিতে বিলম্ব হইল না; খবর পাইয়া গ্রামস্থ পরিচিত ব্যক্তি ও বন্ধুবান্ধবগণ দেখা করিবার ও বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য আমার কুটিরে আসিতে লাগিলেন। তাহারই মধ্যে এক ফাঁকে কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন স্থানীয় ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার সাহেব; সস্নেহে আলিঙ্গন দান করিয়া ও বেদনাক্লিষ্ট অধরে যথাসম্ভব ক্ষীণ হাসির রেখা টানিয়া তিনি বলিলেন, আমার দীর্ঘ বন্দী-জীবনের অবসান আসন্ন জানিয়া তিনি পরম পরিতৃপ্ত; বৃদ্ধ কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার চেষ্টাকৃত সহাস-মুখ যে-কথা কহিতেছে, অশ্রুসজল চোখ তাহার বিরুদ্ধে জ্ঞাপন করিতেছে বিনম্র প্রতিবাদ। বৃদ্ধের অন্তরের স্নেহ-নিবিড় একটি নিভৃত কোণে আমার জন্য একটু বিশেষ স্থান সংরক্ষিত ছিল; আসন্ন বিদায়-আশঙ্কায় সেখানে শূন্যতার যে হাহাকার ধ্বনিয়া উঠিয়াছে তাহার আর্তনাদ ঢাকিবার জন্য বৃদ্ধের প্রাণপণ আয়াস আমাকেও আকুল করিয়া তুলিল, আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বহুক্ষণ নীরব থাকিবার পর পোষ্টমাষ্টার সাহেব বলিলেন, আমার স্ত্রী এবং কন্যা আপনার 'মাতোয়ালা মজনু' শুনিবার জন্য বহুদিন হইতেই আগ্রহ প্রকাশ কারয়া আসিতেছেন, আপনি যে এতশীঘ্র আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন তাহা তো জানা ছিল না, কাজেই বলি ব'লি করিয়াও সেকথা আপনাকে বলা হইয়া উঠে নাই; দয়া করিয়া আজ সন্ধ্যাতেই আমাদের বাসায় চলুন, কবিতাটি পড়িয়া তাঁহাদিগকে শোনাইবেন।

কবিতা! কিন্তু কবিতা তো আমার বহু পূর্বেই দৌলতদিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এখন উপায়! বৃদ্ধের বিষাদক্লিষ্ট মুখের উপর বেদনার ছায়াপাত দেখিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে আমি সোল্লাসে বলিয়া উঠিলাম: অবস্থা একেবারে নিরুপায় নয়, উপায় যা হোক একটা হইবেই; বহু শ্রোতার নিকট বহুবার পাঠ করিতে করিতে কবিতাটি আমার প্রায় কণ্ঠস্থই হইয়া গিয়াছে, কাজেই মগজের ভিতর হইতে তাহাকে কাগজের পৃষ্ঠায় আনিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না; আপনি দারোগা সাহেবকে বলিয়া সন্ধ্যায় আপনার বাসায় যাইবার অনুমতিটা সংগ্রহ করিয়া রাখুন, আমি যথাসময়ে তথায় হাজির হইব। দ্বিপ্রহরের আহারান্তে একান্তে বসিয়া, স্মরণ হইতে উদ্ধার করিয়া কবিতাটি আমি পুনরায় পত্রস্থ করিলাম এবং যথাসময়ে তাহা পকেটে লইয়া উপস্থিত হইলাম পোষ্টমাষ্টার সাহেবের বাসায়।

বারান্দায় কাব্যের আসর পাতাই রহিয়াছে: দাওয়ায় আসন বিছান হইয়াছে আমাদের দুজনের জন্য, অদূরে বসিয়াছেন পোষ্টমাস্টার-দুহিতা এবং গৃহকর্ত্রী উপবিষ্টা রহিয়াছেন ঘরের চৌকাঠের অপর পারে। প্রাথমিক আদর-আপ্যায়ন ও আলাপ-আলোচনার পর কাব্যপাঠ সুরু হইল; কাব্যের বিষয়বস্তু যেমন করুণ, আসরের আবহাওয়া এবং পরিবেশ রচিত হইয়াছে তাহারই সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া। পাঠকসমাজের উদ্দেশ্যে উপহারস্বরূপ সমগ্র কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

অপরাহ্ন বেলা
ক্লান্ত অশ্বারোহী এক চলিতে একেলা
আরবের জনহীন মরুপথ বাহি,
সহসা আকাশ পানে উর্ধ্বমুখে চাহি
তপনের মার্ত-বহ্নে লইল পড়িয়া

বেলা তৃতীয় প্রহর! রশ্মি আকর্ষিয়া
থামাইল অশ্বগতি; ত্রস্তে অবতরি
তুরগ হইতে এক তরুশাখা পরি
বাঁধিল অশ্বের বল্‌গা; নামাজের কাল
হইয়াছে সমাগত। দীর্ঘ করবাল
উন্মোচিয়া কটি হ'তে, খুলিয়া উষ্ণীশ
রাখিল দক্ষিণে-বামে; প্রথম কুর্ণিশ
উদ্যত বলিষ্ঠ ঋজু দীর্ঘ দেহ তার
দীর্ঘতর ছায়া এক করিয়া বিথার
দাঁড়াইল স্তব্ধ হয়ে; ক্ষণকাল পরে
নতজানু যুক্তকর অনুরাগ ভরে
লভিল আসন ভূমে; আরম্ভিল ধীরে
খোদার বন্দনা গান অনুচ্চ-গম্ভীরে
কাননের নহবতে বাজিল অমনি
বিহগ কাকলি-কণ্ঠে ঐক্যতান ধ্বনি।
সহসা দক্ষিণে
ধ্বনিল চরণশব্দ। বিজন বিপিনে
নিঃসঙ্গ যুবক এক এল বাহিরিয়া
বৃক্ষ অন্তরাল হ'তে; ঈষৎ ফিরিয়া
ভ্রূকুটি-কুটিল চক্ষে হেরিল সৈনিক
আয়ত নয়ন তার মুগ্ধ অনিমিখ
চরণ আনত দৃষ্টি, আপনার মনে
লক্ষ্যহীন উদাসীন মন্থর চরণে
নীরবে সমুখ দিয়া যেতেছে চলিয়া

যন্ত্র-পুত্তলির মত ; উঠিল জ্বলিয়া
রুদ্র রোষে ক্ষাত্র তেজ ; কুর্ণিশ-আনত
ন্যুজদেহ ছিন্নগুণ ধনুকের মত
সবেগে হইল ঋজু, শায়িত কৃপাণ
ধরিয়া উদ্যত করে কহে, বেইমান,
এত বড় স্পর্ধা তোর! চকিত পথিক
দাঁড়াল ফিরিয়া, পুনঃ কহিল সৈনিক,
এত বড় স্পর্ধা তোর—খোদার উদ্দেশে
আদাব আমার তুই সম্মুখেতে এসে
গ্রহণ করিলি নিজে, বিরচিয়া ভেদ
কাবা'র আমার মাঝে করিলি ফাসেদ
কাফের, নামাজ মোর! এই অসি দিয়া
খণ্ড খণ্ড করি তোরে দিই বিলাইয়া
শৃগাল-কুক্কুরে যদি, তবু মনস্তাপ
নাহি ঘোচে, মুক্ত তবু নাহি হয় পাপ!
গুণা হয়ে গেছে ভাই—
কহিল যুবক বিনীত কণ্ঠে,
এবে তার মাফ চাই।
কিন্তু বন্ধু, প্রশ্ন জাগিছে তাজ্জব মনে মানি,
করিয়ো না রোষ—জিজ্ঞাসি যদি
কহিও সত্য বাণী :
যার জোলুসের একটি ঝলক—
এক কণা লয়ে নূর
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারারাজি রোসনীতে ভরপুর

সেই সে খোদার রূপের রোসনী
জাগিছে যাহার ধ্যানে
ক্ষীণ চেরাকের জ্বলা আর নেভা
কেমনে সে বল জানে।
সে রূপের ছবি পড়েছে যাহার
মুগ্ধ আঁখির পাতে
কেমনে সে জানে—কে যায়
তাহার সম্মুখে পশ্চাতে।
দোস্ত! সে এক রমণীর রূপে মস্ত
রহিয়া আমি
জানি না কখন কোনদিকে যায়
ছয় ঋতু দিবাযামী।
ভূবন-ভোলান সেইরূপে রহি হরদম মস্‌গুল
খোদা ও নামাজ তামাম দুনিয়া
সব হয়ে গেছে ভুল।
মাগিব না মাফ খোদার আরজে
মাফ চাই তব ঠাঁই,
খোদা জানে, মোর লায়লী ভিন্ন
কেহ নাই—কিছু নাই।
আমি দরবেশ—বেহুঁস দেওয়ানা
লায়লীর রূপধ্যানে
দেখিনি বন্ধু, তুমি যে নামাজ
পড়িতেছ এইখানে!
ভাই, মোর দোষ নাই,
দোষী যদি কেউ সে মোর
প্রিয়ার সুরতের রোসনাই!

কাব্য যখন সৈনিকের সদম্ভ ভাষণ হইতে মজনুর প্রেম-মুগ্ধ স্বগতো ক্তিতে আসিয়া পৌছিয়াছে, স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম—পোষ্টমাস্টার সাহেবের বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে জাগিয়া উঠিয়া ছ বেদনার অস্ফুট আর্তনাদ ; এ ব্যাপার তাঁহার পক্ষে নূতন নয়, বিচিত্রও নয় ; ইতিপূর্বেও এ কবিতা তিনি বহুবার শুনিয়াছেন এবং কোনবারই এইস্থানে আসিয়া আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এবারে কাব্যপাঠের পথে বাধা আসিল এমন এক অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্র হইতে কাব্যের রসবোধ ব্যাপারে যাহার সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিলাম : কাব্য-কাহিনী মজনুর উক্তির উপান্তে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা-শ্রোত্রীদ্বয়ের বক্ষ-বেদনার দীর্ঘশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কাব্যপাঠ যখন সমাপ্তিতে আসিয়া পৌছিয়াছে, তিনটি হৃদয়ের তন্ত্রীতে তখন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে বেদনার ঐক্যতান ; বেদনার অশ্রুবাষ্পে বসন্তের সায়াহ্ন সমীর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল ; তদপেক্ষা অধিকতর ভারাতুর মন লইয়া আমি তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। কে জানিত আরব্ধ কাব্য-বাসর এমন করিয়া শোকসভায় সমাপ্তি লাভ করিবে, লায়লী-মজনুর প্রেম-মুগ্ধ ও বিরহ-সন্তপ্ত জীবন-আখ্যায়িকা সেদিনের কাব্য-বাসরে আসিয়া এমনভাবে আকার পরিগ্রহ করিবে।

আটার

জীবনের ব্যঙ্গ কাব্য

যে ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া তিনটি হৃদয় গভীর সমবেদনায় ব্যথিত — তাহার নিগূঢ় রহস্য আমার অবিদিত নয় এবং তাহা নয় বলিয়াই প্রেমমুগ্ধ মজনুর উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের আঘাতে হৃদয় তিনটিকে একই সঙ্গে উদ্বেল হইয়া উঠিতে দেখিয়া ব্যথিত হইলেও অতিমাত্রায় বিস্মিত হই নাই। যে ব্যক্তিটীকে কেন্দ্র করিয়া এই রহস্য-জাল রচিত হইয়াছে তিনি হইলেন পোষ্ট-মাস্টার সাহেবের বিবাহিতা ও স্বামী-পরিত্যক্তা দুহিতা। তাঁহার কিশোরী কন্যা বিবাহের পর সেই যে প্রথমবার স্বামীগৃহ হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তাহার পর তিনি আর কোন দিনই সে পথে পা বাড়ান নাই। সেদিনের কিশোরী আজ দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সমূহ সম্ভাবনা লইয়া যৌবন-সীমায় আসিয়া উপনীত। স্বামী-বঞ্চিতা ও অদৃষ্ট-লাঞ্ছিতা কন্যার জন্য পিতামাতার দুশ্চিন্তার অন্ত নাই; সে চিন্তা যে শুধু তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহাই নয়, খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত ভবিষ্যতের একটা সংস্থান করিয়া দিবার মত সামর্থ্য পোষ্টমাষ্টার সাহেবের আছে। ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য নয়: ভাবনা এই ভাবিয়া যে, প্রাপ্ত-যৌবনা কন্যার বর্তমান নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ জীবনের শূন্যতা তিনি ভরিয়া তুলিবেন কি দিয়া! বৃদ্ধ পোষ্টমাষ্টার সাহেব সে-ব্যথা কথাপ্রসঙ্গে কতদিন আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন, নির্জনে বসিয়া নিজের মন অনাবৃত করিয়া হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করিয়াছেন। কিন্তু অতঃপর নূতন যে বেদনা আসিয়া তাঁহাকে মর্মান্তিকভাবে বিদ্ধ করিল, নূতন যে দুর্ভাবনার কাল মেঘ আসিয়া তাঁহার মনের আকাশে উদিত

হইল—অন্ত কোন জনের কাছে তাহা খুলিয়া বলিবার ও তুলিয়া ধরিবার মত সামগ্রী নয়। বৃদ্ধ তাই সেই অব্যক্ত যাতনার জারকরসে তিল তিল করিয়া জীর্ণ হইতে লাগিলেন।

স্থানীয় মসজিদে নোয়াখালি হইতে একটি যুবক মৌলবী আসিয়াছিলেন; শুনিতাম, বৃদ্ধ পোষ্টমাস্টার এই যুবকটিকেই তাঁহার ভাবী জামাতারূপে বরণ করিয়া রাখিয়াছেন। মৌলবী সাহেবের আর কোন গুণ ছিল কিনা জানিনা, তবে কণ্ঠে তাঁহার সুর ছিল অতি সুমধুর। দিন ও রাত্রির প্রহর ভেদে যে, আজানের সুরের পার্থক্য ঘটে, তাহা সর্বপ্রথম শুনিলাম, এই মৌলবীর কণ্ঠে; কি দিনে, কি রাত্রিতে আমরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আজানধ্বনি শুনিতাম আর মন তাহারই সুর-তরঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইত তরঙ্গায়িত বায়ুস্তরে। দৈবের এমনি যোগাযোগ যে, মৌলবী সাহেব যে-পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন সঙ্গীতের সুরলহরী তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নিত্য লীলায়িত। কতদিন পোস্টমাস্টার সাহেবকে একক গান গাহিতে শুনিয়াছি, সপত্নীক সুর সহযোগে কোরাণপাঠ করিতে শুনিয়াছি আর মুগ্ধ হইয়াছি বৃদ্ধ-দম্পতির কণ্ঠের লালিত্য ও মাধুর্যের রসাস্বাদন করিয়া। পোস্টমাস্টার দুহিতাকেও গাহিতে শুনিতাম আর মনে হইত, একটি অদেখা পিক্ যেন সুরতরঙ্গে অসীম শূন্য প্লাবিত করিয়া লঘুপক্ষে উর্ধ্ব আকাশে উড়িয়া চলিয়াছে।

একদা একটি দুর্ঘটনার আকস্মিক আঘাতে সমগ্র পরিবারটির সহজ ও সচ্ছন্দ জীবন-স্রোত সহসা আবর্তিত হইয়া উঠিল: পোস্টমাস্টার-দুহিতার জীবনে আবির্ভাব হইল নূতন এক ব্যক্তির এবং তিনি আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহিত মৌলবী সাহেবের মানসিক সম্পর্কের ভারকেন্দ্রে দেখা দিল ঈষৎ বিচলন; দেখিতে দেখিতে সে-আন্দোলন আলোড়নে

পরিণত হইল এবং তাহারই আঘাতে ভারকেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হইতে বিলম্ব হইল না। নূতন এই আবির্ভাবের কথা অচিরে পোস্টমাস্টার সাহেবের গোচরে আসিল; তিনি তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে চাহিতেন, কিন্তু তাহা করিতে গিয়া যখন দেখিলেন, তাহার পশ্চাতে ক্রিয়ারত রহিয়াছে পত্নীর প্রভাব ও কন্যার প্রেম, তিনি স্নেহবশে সেখান হইতে পশ্চাদপসরণ করিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বুঝাইতে চাহিতেন, যে, কন্যার জীবনে আজ যাহা প্রণয় আগামী কাল তাহা পরিণয়ে পরিণত হইবেই, অবশ্য সে-সম্ভাবনা যে লোভনীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু পোস্টমাস্টার সাহেবের মন সে ভবিষ্যবাণীতে ভরসা মানিতে চায় না, সে আশায় আশ্বস্ত হইতে চায় না; একান্ত গোপনীয় সে অন্তর্দ্বন্দ্বের নিগূঢ়তত্ব তো আর পাঁচ জনের কাছে খুলিয়া বলিবার নয়! বৃদ্ধ জানিতেন, সে-তত্ব আমার অজ্ঞাত নয়, তবু মন খুলিয়া সে কথা কোন দিন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিতে পারেন নাই; আমিও বুঝিতাম, তাঁহার সে বেদনার উৎসমূল কোথায়, তবু মুখ ফুটিয়া কোন দিন তাঁহাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারি নাই। তাই আমাদের দুজনের মধ্যে ভাব-বিনিময় হইয়াছে নীরব ভাষায়; একের বক্ষ-স্পন্দনে আমরা অন্যের অন্তরের বাণী শুনিয়াছি। কতদিন গভীর রাত্রে বৃদ্ধ আসিয়া আমার ঘরের রুদ্ধ-দ্বারে করাঘাত করিয়া ঘুম হইতে আমাকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন এবং কোনরূপ প্রশ্ন করিবার পূর্বেই বুকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়াছেন, কবি সাহেব! আমি বড় দীন, বড় দুঃখী; চিন্তার তাড়নায় কোনরূপে চোখের পাতা বুজিতে না পারিয়া আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি; দয়া করিয়া আপনার বুকের স্পর্শ দিন আমার এই পোড়া বুকের উপর! দেখি সে ছোঁয়ায় যদি আমার অন্তরের তুষানল নেভে, দগ্ধ হৃদয়ের তীব্র জ্বালা জুড়ায়! নিভৃত নিশীথের গভীর নীরবতায় দুইটি

হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনে ধ্বনিত হইয়াছে, দুইটি অন্তরের অকথিত ভাষা, দুইটি চোখের অশ্রুজলে রচিত হইয়াছে অব্যক্ত যাতনার যুক্তবেণী।

রঙ্গমঞ্চের এক প্রান্তে যখন এই দৃশ্যের অভিনয় চলিতেছে, তাহার অপর প্রান্তে তখন অভিনীত হইতেছে বিয়োগান্ত নাটকের এক মর্মান্তিক দৃশ্য: আপন জীবনস্বপ্নের পরিপ্রান্তে যে নূতন এক উপগ্রহের উদয় হইতেছে মৌলভী সাহেবের দৃষ্টি তাহা না এড়াইবারই কথা; তাহার গতিবেগের মাত্রা মাপিয়া তিনি সম্ভবত ইহাও হিসাব করিয়া লইয়াছেন যে, তাহার বর্তমান বেগ যদি বাহাল থাকে, তাহা হইলে দ্রুত ধাবমান উপগ্রহের কৃষ্ণছায়ায় সমগ্র জীবন-আকাশ আচ্ছন্ন হইতে খুব বেশীদিন বিলম্ব হইবে না। কিন্তু এই নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে বুদ্ধি দিয়া উপলব্ধি করা এক কথা এবং হৃদয় দিয়া তাহার সেই সর্বনাশা সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়া লওয়া ভিন্ন কথা: তাই কিছুটা স্বভাব ও কিছুটা সম্পূর্ণ পূর্বসংস্কারবশে তিনি তখন পর্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিতভাবে আজানের মাধ্যমে প্রেমাস্পদের উদ্দেশে প্রণয়ের আবেদন জানাইয়া চলিয়াছেন। খোদা দূরবর্তী লক্ষ্য হইলেও, সুর জানিত তাহার আশু গন্তব্য-স্থান কোথায়। এই কারণে বেদনায় ভারাক্রান্ত সে-সুর ক্লান্তপক্ষ বিহঙ্গের মত উর্ধ্বে উঠিতে না পারিয়া গুঞ্জরণ করিয়া মরিত এক মর্ত-মানবীর চরণপ্রান্তে। তিনি অবশ্য পদাঙ্গুলি দিয়াও আর তাহা স্পর্শ করিতেন না, কিন্তু আজানধ্বনি মুখ্যত যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চার্য—তিনি তো অন্তর্যামী, মানব-হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম চিন্তার উত্থান-পতনও তাঁহার অগোচর নয়; কে জানে, বেদনার্ত সে সঙ্গীতের পথভ্রান্ত সুরটিকে সস্নেহে তিনি কোলে তুলিয়া লইতেন কিনা, তাহার গাত্র হইতে গ্লানি ও ব্যথাভার সযত্নে মুছাইয়া দিতেন কিনা?

আজানধ্বনি স্তব্ধ হইলে পোস্টমাস্টার সাহেবের গৃহ-বাতায়নে বাজিয়া

উঠিত কথনও আনন্দের আশাবরী সুর, আবার অন্য কথনও বা বেদনার বেহাগ রাগিণী। মৌলবী সাহেব সব কথা জানিয়া বুঝিয়াও সম্ভবত স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আপনাকে এই সান্ত্বনায় বঞ্চনা করিতে চাহিতেন, যে, তাঁহার সুরের স্নেহস্পর্শেই হয়তো এই গানের গোলাপ ফুটিয়া উঠিয়া থাকিবে, এই আবেগ-বিহ্বল সঙ্গীত হয়তো বাজিয়া উঠিয়া থাকিবে তাঁহার আকুল আবেদনেরই জবাবে। মৌলবী সাহেবের আত্মবঞ্চনার আলেয়ার আলোতে পোস্টমাস্টার-দুহিতার সঙ্গীত কিন্তু পথভ্রান্ত হইত না, তাঁহার আত্ম-বিড়ম্বনায় বিক্ষিপ্ত হইয়া সে সঙ্গীত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইত না, বায়ুস্তর বিদীর্ণ করিয়া ঋজু রেখায় ভাসিয়া গিয়া তাহা স্পর্শ করিত যথাস্থানে। কে, সে কৌতুক-প্রিয় অকরুণ বিধাতা—মানুষের জীবন লইয়া যিনি এমন রূঢ় ব্যঙ্গ-কাব্য প্রণয়ন করেন, মানুষের জীবন-সর্বস্ব প্রেম লইয়া এমন নিষ্ঠুর প্রহসন রচনা করেন !

উনিশ

বাজিকর গঙ্গারাম

গঙ্গারামের কাহিনী না বলিলে দৌলতদিয়ার কথা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।' গঙ্গারাম পশ্চিম দেশীয় একজন যাদুকর, দৌলতদিয়া গ্রামকে আস্তানা করিয়া সে সমগ্র ফরিদপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে বাজী দেখাইয়া বেড়াইত। ইহাই ছিল তাহার উপজীবিকা এবং ইহার আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই সে নিজের ও তাহার রক্ষিতা একটি গণিকার ভরণ-পোষণের সংস্থান করিত।

একদিন আমরা হাট হইতে বাসায় ফিরিতেছি, দেখি, এক

পুকুরের পাড়ের একটি গাছতলায় সে উলঙ্গ অবস্থায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। খোঁজ লইয়া জানিলাম, সে কলেরা রোগে আক্রান্ত, এই জন্য তাহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকটী তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে; কাজেই তরুতল-আশ্রিত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিটির চিকিৎসা ও ঔষধ-পথ্যের সেবা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা দূরে থাক, মৃত্যুকালে মুখে একবিন্দু জল দিবার পর্যন্ত লোকের অভাব। লোকটিকে অসহায় অবস্থায় এইভাবে মরিতে দিতে তো পারা যায় না, তাহার চিকিৎসার ও সেবা-পরিচর্যার একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে। আমরা স্থির করিলাম, একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে দেখাইবার পর আমরা চারজনেই পালাক্রমে তাহার পরিচর্যা করিব এবং চিকিৎসার ব্যয়ভার চারজনে মিলিয়া চাঁদা করিয়া বহন করিব। থানায় আসিয়া দারোগা সাহেবকে আমাদের কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে কপালে চোখ তুলিয়া বলিলেন, বলেন কি মশাই, আপনারা করিবেন কলেরা-রুগীর সেবা! তাহার পর সংক্রামক ব্যাধির কল্যাণে আপনাদের মধ্যে দুই একজন যদি টাঁসিয়া যান তখন সে-কাজের জন্য কৈফিয়ৎ দিবে কে এবং দিবার মত কৈফিয়ৎই বা কি থাকিবে? আপনারা সরকারী মাল, আমার জিম্মায় জমা আছেন, চাহিবামাত্র ফিরাইয়া দিবার অঙ্গীকারে। কাজেই বিপজ্জনক কোন ব্যাপারে আপনাদিগকে যাইতে দেওয়া আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। জবাবে আমরাও জানাইয়া দিলাম, লোকটিকে অসহায় অবস্থায় পথের ধারে পড়িয়া মরিতে দিতেও আমরা কোনক্রমেই রাজি নই; রুগীর পরিচর্যা করিতে গিয়া আমাদের মধ্যে এক-আধ জন যদি টাঁসিয়াও যাই, তাহার জন্য দারোগা সাহেবের পদোন্নতি তো হইবেই, চাই কি ইনাম, এমন কি খাঁ-সাহেবী খেতাব পর্যন্ত মিলিতে পারে। দারোগা সাহেব যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন,

আর খেতাবে কাজ নাই মশাই, দীর্ঘপথ পর্যটন করিয়া জীবনের অবেলায় খেয়াঘাটে আসিয়া পৌছিয়াছি, এখন ভালোয় ভালোয় পার হইতে পারিলে বাঁচি। দারোগা সাহেব প্রতিশ্রুতি দিলেন, গঙ্গারামের যাহাতে গঙ্গাযাত্রা না ঘটে, সে-ব্যবস্থা তিনিই করিবেন, আমরা তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সে-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

দারোগা সাহেবের দোয়ায় গঙ্গারাম সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু তখন কে জানিত—অচিরেই সে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইবে গভীর এক রহস্যের দুর্জ্ঞেয় নায়করূপে। একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে দারোগা সাহেব আসিয়া বলিলেন, আজ সন্ধ্যায় থানায় গঙ্গারামের ম্যাজিক ও তৎসহ রহস্যপূর্ণ এক নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ রহিল, অনুগ্রহপূর্বক যথাসময়ে তথায় যাইয়া খেলোয়াড়ীর একটা খেল্ দেখিয়া আসিবেন। গঙ্গারামের যাদুবিদ্যা-প্রদর্শনী তো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, তাহার জন্য আমরা বিশেষ কৌতূহল বোধ করিলাম না, কিন্তু রহস্যপূর্ণ নাটকটা যে কি বস্তু তাহা ভাবিয়া পাইলাম না এবং দারোগা সাহেবকে প্রশ্ন করিয়াও তাহার কোন সদুত্তর পাইলাম না। তিনি শুধু বলিলেন, নাটকের রহস্য এখন ফাঁস করা হইবে না, সরজমিনে তাহা দ্রষ্টব্য। কৌতূহলে ও উৎকণ্ঠায় কোনরূপে দিন কাটিল, সন্ধ্যা হইতেই থানাসংলগ্ন ছোট মাঠটিতে লোক সমাগম হইতে লাগিল, যথাসময়ে ঝুলি-ঝাপ্টাসহ গঙ্গারামও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পর্দা টাঙাইয়া জিনিষ পর্যন্ত বিছাইতে আরম্ভ করিল। তখন পর্যন্ত রহস্যপূর্ণ কোন কিছু চোখে পড়িল না, অবশ্য একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া। বিকালের দিকে দেখি, জনকয়েক পশ্চিমদেশীয় মুসলমান লটবহর ও লোকজনসহ থানায় আসিয়া ঢুকিলেন; চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদের জাঁকজমক দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি বলিয়া মনে হইল; বাংলার এক

পল্লীগ্রামে এই ধরণের লোকের আগমন নিঃসন্দেহে একটা অস্বাভাবিক ঘটনা; কৌতূহলী হইয়া দারোগা সাহেবকে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মৃদুহাস্য সহকারে তিনি বলিলেন, রহস্য-নাটকের ইহাই তো সবেমাত্র প্রস্তাবনা, সন্ধ্যাবেলায় রহস্য-যবনিকা উত্তোলিত হইলে আসল অভিনয় আরম্ভ হইবে; এখানে আপাতত এইটুকু বলিয়া রাখি যে, ইহারা নাট্যোল্লিখিত চরিত্রসমূহের অন্যতম, অতঃপর প্রধান চরিত্রের অর্থাৎ নায়কের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের প্রতীক্ষায় থাকুন।

স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, নাটকের প্লট যেমন জমিয়া উঠিতেছে—তাহা রহস্যঘন হইয়া উঠিতেছে ঠিক সেই অনুপাতে। এখন পর্যন্ত দারোগা সাহেবের পরিচালনা বেশ দক্ষতা পূর্ণই হইয়াছে; নাটকের আসল বিষয়বস্তুটিকে আড়ালে রাখিয়া তিনি এমন দক্ষতার সহিত মুখবন্ধ রচনা করিয়াছেন যে, তাহা দেখিয়া অনুমান করা দুঃসাধ্য—যবনিকা উত্তোলিত হইলে কোন্ দৃশ্যপট দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে! উৎকণ্ঠার মুহূর্তগুলি লঘুপক্ষে আকাশপথে উড়িয়া যায় না, মন্থরগতিতে মাটির বুকে হাঁটিয়া চলে। কথাপ্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল—মৃত্যু সম্বন্ধে এক মনস্তাত্ত্বিকের মন্তব্যের কথা: মৃত্যু-ভয়ের হেতু বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি রীতিমত এক রস-কাব্য রচনা করিয়া বসিয়াছেন: তাঁহার মতে মৃত্যুকে যে আমরা ভয় করি তাহা বস্তুতঃপক্ষে মৃত্যুভীতির জন্য নয় মৃত্যুপ্রীতির জন্য। প্রকৃতির যে পঞ্চ-উপাদান দিয়া আমাদের দেহ গঠিত, ঘটনাচক্রে তাহা পট হইতে নির্বাসিত হইয়া ঘটে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, কাজেই তাহারা সর্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকে পুনরায় তাহাদের আদিম আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য; মৃত্যু সে সুযোগ ও সম্ভাবনার আশ্বাস লইয়া যখন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—প্রার্থিত ক্ষণটি সমাগত দেখিয়া উপাদান-পঞ্চক দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠে।

কিন্তু যে পুলক-হর্ষ হাসি রূপে বিচ্ছুরিত হওয়া উচিত ছিল, বেদনার অশ্রুধার রূপে তাহা ঝরিয়া পড়ে কেন? সে নিগূঢ় রহস্যের মর্মকথা প্রণয়ের গোপন সঞ্চারের মতই রোমাঞ্চকর। প্রেমমুগ্ধা তরুণী যেমন তাহার প্রণয়াস্পদের সঙ্গ কামনা করে সমগ্র অন্তর দিয়া, অথচ সে-সুযোগ সমুপস্থিত হইলে আগ্রহব্যাকুল অন্তর যদিও মিলনের জন্য অধীর, লাজ-ভীরু কিশোরীচিত্ত তথাপি কুণ্ঠা কাটাইয়া উঠিতে না পারিয়া, সসঙ্কোচে একান্তে সরিয়া রয় আর দুঃসহ সে-অবস্থার জন্য আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কবির ভাষায় মনে মনে গাহিয়া উঠে :

মন চায় চক্ষু না চায়
মরি একি তোর দুস্তর লজ্জা!

কিন্তু কি সে লজ্জা—কিসের সে লজ্জা যাহার জন্য বাস্তবে রূপায়িত জীবন-স্বপ্নকে সে সানন্দে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বরণ করিয়া লইতে পারে না? সে কি পুরুষের সমীপস্থ হইবার জন্য নারীর স্বভাবসুলভ সত্যকার ব্রীড়া ও সঙ্কোচ? কদাচ নহে: জীবনের যে চরম ও পরম ক্ষণটির জন্য নারী-হৃদয় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, প্রণয়ের সে দুর্লভ প্রথম স্পর্শটুকু লাভের জন্য। নারী জীবনের যে বাঞ্ছিততম আনন্দ ও আশীর্বাদটুকু আস্বাদনের জন্য তাহার সত্তাসমগ্র উন্মুখ হইয়া আছে তাহা এত শীঘ্র ধরার ধূলায় নামিয়া আসিয়া আলিঙ্গনে ধরা দিবে—ইহা যে স্বপ্নেরও অতীত। যে সুখ ও যে সৌভাগ্য জীবনে অতি ক্ষুদ্র একটিমাত্র মুহূর্তের জন্য একটিবার মাত্র লভ্য, একবার আস্বাদিত হইবার পর বর্তমান অনুভূতির ক্ষেত্র হইতে সেই যে তাহা অতীত অভিজ্ঞতার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আশ্রয় গ্রহণ করে—শত সাধ্য-সাধনাতেও আর দ্বিতীয়বার জীবনের বাস্তব-ভূমিতে আসিয়া পদার্পণ করে না। তাই এত শীঘ্র তাহাকে বরণ করিয়া লইয়া এত সত্বর বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতে মন

সরে না, নারী-প্রকৃতি তাই আপনাকে আশু বঞ্চিত করিয়াও সরম ও সঙ্কোচের ছদ্মব্যবধান রচনা করিয়া জীবনের চরম ও পরম মুহূর্তটিকে লীলাচ্ছলে বিলম্বিত করিতে চায়। মাটির মোহ কাটাইয়া উঠিবার যে কাতরতা মুমূর্ষু ব্যক্তির অন্তিম আকুতিতে ব্যক্ত হইয়া উঠে—দীর্ঘ প্রবাস-জীবন-যাপনের পর স্ববাসে ফিরিয়া যাইবার শুভক্ষণটিকে বিলম্বিত করিবার নিমিত্ত দৈহিক উপাদান সমূহের তাহা কৃত্রিম ক্রন্দন ছাড়া আর কিছু নয়।

সন্ধ্যায় থানা-প্রাঙ্গনে রহস্যপূর্ণ নাটক অভিনয়ের ক্ষণটির জন্য মন আমার মনে মনে যদিও অত্যন্ত ব্যাকুল, কিন্তু বেলা যেমন পড়িয়া আসিতেছে, ইচ্ছা হইতেছে, সূর্যের রথচক্র চাপিয়া ধরিয়া তাহার গতিবেগ মন্থর করিয়া দিই। দ্রুত ধাবমান কালের প্রবাহমুখে বাঁধ দিয়া তাহার স্রোতধারা শ্লথ ও স্তিমিত করিয়া দিই; রহস্য উদ্ঘাটনের সম্ভাবিত শুভক্ষণটি তাহার গতিপথে ব্যাহত হোক, বিলম্বিত হোক। বন্দী-জীবনের বৈচিত্র্যহীন নিরানন্দ দিনগুলি রহস্যলহরী সিরিজের রোমাঞ্চকর গ্রন্থরাজি নয়, রহস্যপুলকের অবকাশ সেখানে অতি অল্পই ঘটে; ভাগ্যক্রমে আজ অবশ্য তাহার সাক্ষাৎলাভের দুর্লভ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু এ ক্ষণটি অতিক্রান্ত হইয়া গেলে, এ অভিজ্ঞতাটুকু উপলব্ধ হইয়া গেলে আবার তাহা কবে আসিবে, আদৌ তাহা আর কোনদিন ফিরিয়া আসিবে কিনা তাহা কে জানে! সন্ধ্যা তথাপি আসিল এবং তাহার সহিত আসিল গঙ্গারাম তাহার যাদুবিদ্যার আসবাব পত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সাথে লইয়া। কৌতূহলী জনতার আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টিকে পর্দার আড়ালে অন্তরাল করিয়া সে যখন জিনিষপত্র সাজাইতে-গুছাইতে ব্যস্ত, এমন সময় আমরাও তথায় গিয়া হাজির হইলাম। খেলা আরম্ভ হইল; দর্শকবৃন্দের সপ্রশংস করতালি ধ্বনিতে প্রদর্শনীক্ষেত্র মুখর,

গঙ্গারাম অঙ্গভঙ্গী সহকারে বাজী অপেক্ষা বাক্যের কারসাজি বেশী দেখাইয়া চলিয়াছে; এমন সময় অভাবনীয় এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল: গঙ্গারাম বিভীষিকাগ্রস্ত ব্যক্তির মত তাহার প্রসারিত দুই হস্ত তদবস্থ রাখিয়াই একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া নির্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া গেল। তাহার যাদু-দণ্ড শিথিলমুষ্ঠি হইতে স্খলিত হইয়া লুটাইয়া পড়িল মাটির বুকে। দর্শকগণ যখন এই অবস্থান্তরের হেতু নির্ধারণ করিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে ভাবিতেছে, প্রদর্শনীয় যাদুবিদ্যারই ইহা হয়তো দফা বিশেষ হইবে—এমন সময় পশ্চাতে কি যেন একটা কোলাহল উত্থিত হইল; ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, সেদিনের সমাগত সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোকটি দুই বাহু বিস্তার করিয়া দর্শকদলের শ্রেণী ভেদ করিয়া গঙ্গারামকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন! বিহ্বল-জনতার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত দুই বাহু দিয়া তিনি গঙ্গারামকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন আর ঐন্দ্রজালিক গঙ্গারাম নিঃশেষে সে-আলিঙ্গনতলে আত্মসমর্পণ করিয়া অভিমান ক্ষুব্ধ শিশুর মত নীরবে রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু একি দুর্জ্ঞেয় রহস্য, একি অভাবনীয় অঘটন! পশ্চিমদেশীয় এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহিত হিন্দু বাজিকর গঙ্গারামের সম্ভাব্য সম্পর্কটা কি! তাহাদের মধ্যে কেন এই আলিঙ্গন ও অশ্রু-বিসর্জনের লীলা-অভিনয়। কূল-কিনারা না পাইয়া রহস্যসাগরে আমরা যখন ভাসমান, এমন সময় দারোগা সাহেব গোপন-রহস্য-লোকের চাবিকাঠি লইয়া রঙ্গমঞ্চে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। সেদিনের রহস্য সম্বন্ধে দারোগা সাহেবের প্রদত্ত বিবরণী নিম্নে বিবৃত হইল: আগত মুসলমান ভদ্রলোকগণের মধ্যে একজন পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের জনৈক মন্ত্রী এবং গঙ্গারাম নামক তথাকথিত এই বাজিকর তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র। যে-কোন কারণেই হোক, অভিভাবকগণ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সে বহুদিন পূর্বে গৃহত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসে এবং বাজিকরের বিদ্যা

আয়ত্ত করিয়া তাহাকেই সে পেশারূপে গ্রহণ করে ; পেশাদার বাজিকর-রূপে বহুস্থান বেড়াইবার পর সম্প্রতি ছদ্মনামে ও মিথ্যা-পরিচয়ে দৌলতদিয়ায় আসিয়া সে স্থায়ী আস্তানা গড়িয়া তুলিয়াছে। গঙ্গারামের অভিভাবকগণ নিরুদিষ্ট সন্তানের সন্ধানলাভের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া তাহার ফটোসহ যে বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রচার করেন—মাত্র কয়েকদিন পূর্বে দারোগা সাহেবের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় এবং দারোগা সাহেবের অভিজ্ঞ পুলিশকর্মচারীসুলভ-নিপুণ-দৃষ্টি ফটোর সহিত গঙ্গারামের চেহারার অবিকল সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়। দারোগা সাহেব একদিকে গোপনে অভিভাবকগণকে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়া দিনক্ষণ স্থির করিয়া পত্র দেন এবং অপরদিকে নির্ধারিত দিনক্ষণে গঙ্গারামের ম্যাজিক প্রদর্শনীর আবশ্যকীয় আয়োজন সম্পন্ন করিয়া রাখেন। গঙ্গারাম বেচারী ধারণাও করিতে পারে নাই, সেদিনের খেলার ক্ষেত্রে ইন্দ্রজালের এক অধিকতর চমকপ্রদ খেলা দেখিয়া দর্শকগণের আসরে সত্য সত্যই ভেবাগঙ্গারাম বনিয়া বেকুব হইতে হইবে। ধরা পড়িবার পরেই গঙ্গারামকে পুনরায় গোত্রভুক্ত করিবার জন্য সুরু হইল মার্জন মদন ও সাজ-সজ্জার পালা : নাপিত আসিয়া তাহার চুল ছাঁটিয়া দিল, খানসামা সাবান সহযোগে গাত্রমার্জন করিয়া স্নান করাইয়া দিল ; সম্ভ্রান্ত বংশীয় সন্তানের উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সে যখন যবনিকার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া সাধারণের সমক্ষে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, তখন তাহার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়া গিয়াছে। পথের ফকির যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে মুহূর্তে পরিণত হইয়াছে আমীর ও ওমরাহজাদায়! ইতিমধ্যে গঙ্গারামের রূপান্তরের কাহিনী অলৌকিক রূপ-কথার মত গ্রামময় রটিয়া গিয়াছে ; সমবেত জনতার নিকট সবিনয়ে অভিবাদন জানাইয়া গঙ্গারাম বিদায় লইল। গ্রাম্য-জীবন হইতে

সে-রহস্যের রোমাঞ্চ বিলীন হইতে বিলম্ব হইল না ; তাহার পর ধূলি-ধূসর পল্লীপথে গ্রাম্য জীবন শকটের তৈলবিহীন যুগলচক্রে পুনরায় বাজিয়া উঠিল দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়ে ও একটানা আর্ত ক্রন্দন। আর আমরা! আমাদের সত্তার অসাড় ও অনড় প্রাণহীন বস্তুপিণ্ড সে শকটের চক্রনেমীর সহিত অসহায়ভাবে লগ্ন রহিয়া আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া-পড়িয়া, আছাড় খাইয়া জীবনের পথে আগাইয়া চলিল।

কুড়ি

নীড়ে ফেরা পাখী

নির্বাসিত পাখী পুনরায় নীড়ের পথে পাখা মেলিল। ব্যথা ও আনন্দে, আশা ও আশঙ্কায় আন্দোলিত মন লইয়া দীর্ঘদিন পরে বন্দী-জীবন হইতে বাড়ী ফিরিতেছি। সময় খুব বেশী দীর্ঘ না হইলেও ইহারই মধ্যে আমার ব্যক্তিগত ও পরিবার-জীবনের উপর দিয়া একটা প্রলয় বহিয়া গিয়াছে ; মনের মধ্যে ভাব-দ্বন্দ্ব তোলপাড় করিতেছে : যাহা ফেলিয়া গিয়াছি তাহা কি পুনরায় ফিরিয়া পাইব, যাহা হারাইয়া গিয়াছে তাহা কি আবার হাতে আসিবে! বহরমপুর আই, বি, অফিসে আসিয়া দেখি, স্বগৃহে অন্তরীনের আদেশ তথায় আমার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছে ; নির্দেশের কঠোরতা দেখিয়া মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল, আদেশপত্র ছিঁড়িয়া আই, বি, অফিসারের মুখে ছুঁড়িয়া মারি। গৃহে ফিরিবার জন্য আমি তো কাহারও কাছে আবেদন জানাই নাই, তবে বাড়ীর নামে বন্দীশালায় পুনঃ প্রেরণের এই নিষ্ঠুর পরিহাসের অবতারণা

কেন? দীর্ঘকালব্যাপি সাধ্যসাধনার দ্বারা জেলকে ঘর-বাড়ী করিয়া তোলা বরঞ্চ সম্ভব, কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া জেল-যন্ত্রণা ভুগিবার মত ভাগ্যবিড়ম্বনা আর দ্বিতীয় নাই। আদেশ-পত্র প্রত্যাখান করিব কিনা ভাবিতেছি এমন সময় জিয়াগঞ্জগামী একখানা বাস আসিয়া পুলিশ-আফিনের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং তাহা হইতে নামিয়া আসিল আমাদের চিরপরিচিত নারায়ণ ড্রাইভার। তাহাকে দেখিবামাত্র মনের মধ্যে পুঞ্জিত জিয়াগঞ্জের স্মৃতির সমস্ত সঞ্চয় মহূর্তে উদ্বেল হইয়া উঠিল, দুবলতাবশে আদেশ-পত্র প্রত্যাখ্যান করা আর হইয়া উঠিল না।

সর্বাগ্রে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল বাবার চিন্তা; তিনি বাতব্যাধিগ্রস্ত এবং ব্যাধির আক্রমণ ঘটিয়াছিল উর্ধ্বাঙ্গে, কাজেই যে কোন রূপ হৃদয়াবেগের আকস্মিক আঘাত তাঁহার পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে। পূর্বাহ্নে কোনরূপ সংবাদ না দিয়া দীর্ঘদিন পরে বাড়ী ফিরিতেছি, তাই আশঙ্কা হইল, আমার অপ্রত্যাশিত আগমনজনিত বিপুল ভাবাবেগ যদি তিনি সহ্য করিতে না পারেন, অসহ আনন্দের আকস্মিক আঘাত যদি তাঁহার পক্ষে মারাত্মক হয়! নারায়ণ ড্রাইভারকে বাসে বসিয়াই ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, আমি সরাসরি বাড়ী না গিয়া জিয়াগঞ্জ থানায় বসিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিব, ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ী গিয়া কথায় কথায় বাবার নিকট আমার প্রসঙ্গ তুলিবে, আমার আগমন-সম্ভাবনার বার্তা এক এক মাত্রা প্রয়োগ করিয়া দেখিবে বাবার উপর তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়; এইরূপে মাত্রাক্রমে প্রয়োগ করিতে করিতে অবশেষে সে জানাইবে যে, আমি তাহারই বাসে জিয়াগঞ্জ থানায় আসিয়া পৌছিয়াছি এবং শীঘ্রই বাড়ী আসিতেছি। সংবাদ পরিবেশন ও তাহার প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণসহ নারায়ণ ড্রাইভার ফিরিয়া আসিলে, ভারাক্রান্ত মন লইয়া মন্থরপদে বাড়ী রওয়ানা,

হইলাম। থানা হইতে আমাদের বাড়ী ঢিলের পাল্লার মধ্যে পড়ে, সুতরাং দীর্ঘপথ পর্যটন করিতে হইল না। মন যদিও একান্তভাবে চাহিতেছিল, যাত্রাপথ দীর্ঘায়িত হোক, গৃহ-প্রবেশের ক্ষণ বিলম্বিত হোক!

যতদূর মনে পড়ে, সেদিন ছিল একাদশী, বারান্দায় উঠিয়া খোলা জানালা দিয়া ভিতরে চাহিয়া দেখি, বাবা আহারে বসিয়াছেন; তাঁহার ডান হাতখানি থালার উপরে স্থাপিত, তাঁহার দুই চোখ সাগ্রহে আমার আগমন-পথ নিরীক্ষণ করিতেছেনা, সুদূরে উদাসদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চাহিয়া আছে সম্মুখে আকাশপানে!

খোলা দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ না করিয়াই জানালায় দাঁড়াইয়া অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম : বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পূর্বদিক হইতে দক্ষিণদিকে ফিরিল। বাবা আবেগ-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে ফুকারিয়া উঠিলেন : আমি এ ডাক যে কতদিন শুনি নাই রে! ছুটিয়া গিয়া পায়ে মাথা রাখিলাম; বাম হাতখানি মাথার উপর স্থাপন করিয়া তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া প্রতিবেশী ও পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের দল বাড়ী আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন; আবেগের প্রথম আঘাত কাটিয়া গেলে, নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহাদের দিকে মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইলাম।

বাবা বরাবরই মনে মনে এই আশঙ্কা পোষণ করিতেন ও কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই প্রকাশ করিতেন, যে, যদিও তিনি পুত্রের পিতা তথাপি একথা তিনি ভালভাবেই জানেন যে, মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্রের হাতের জলবিন্দু তাঁহার শেষ তৃষ্ণা তৃপ্ত করিবে না, মৃত্যুর পর তাহার হাতের মুখাগ্নি তাঁহার লভ্য হইবে না। আশঙ্কা যদিও একেবারে অমূলক নয়, তথাপি

দৈবক্রমে সে আশঙ্কা কার্যে পরিণত হয় নাই। মৃত্যুকালে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বেই ছিলাম এবং আমার কোলে মাথা রাখিয়াই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর দিনকয়েক পূর্ব হইতেই আসন্ন মৃত্যুর নিকটতর পদধ্বনি তিনি যেন প্রতি মুহূর্তে শুনিতে পাইতেন ; রাত্রি আসিলেই তাঁহার দুই চোখ অস্বাভাবিক রকম বিস্ফারিত হইত এবং বর্ধিত আয়তন দুই চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি লইয়া তিনি যেন কাহাকে খুঁজিতেন, কি যেন নিরীক্ষণ করিতেন।

রাত্রি হইলেই এই ভাবান্তর উপস্থিত হইবার হেতু সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া এক দিন প্রশ্ন করিলে স্মিতহাস্যে বাবার রোগশীর্ণ-মুখখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কতকটা স্বগতকণ্ঠেই তিনি বলিলেন, ইদানীং তোমার মা রোজ রাত্রিকালে আসিতেছেন কি না, তাই দেরী হইলেই তাঁহার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকি। কথাটা শুনিবামাত্র আমার সারাদেহ পুলকে ও বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল : মনে হইল ইহাও কি সম্ভব। বহুদিন পূর্বে পরলোকগতা জননী আমার আজও কি পার্থিব আকর্ষণের পরিধি-রেখা পার হইতে পারেন নাই, আজও কি তাই রোগশয্যায়-শায়িত স্বামীর পার্শ্বে নিত্য আসিয়া তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে হয়! হয়তো ইহা বাবার ব্যাধিগ্রস্ত মনের মোহঘোর হইবে, হয়তো বা ইহা তাঁহার নিদ্রাহীন উত্তপ্ত-মস্তিষ্কের চিন্তা-বিকার হইবে। ইহারই দিনকয়েক পরের ঘটনা : একদিন প্রায় মধ্যরাত্রির দিকে রোগীর পরিচর্যার ভার আমার স্ত্রীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শয্যা-গ্রহণের সুযোগ দিলাম এবং বাকী রাত্রিটুকুর জন্য প্রস্তুত হইয়া বাবার পার্শ্বে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিলাম। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এই পাহারা বদল সম্বন্ধে বাবা সম্পূর্ণরূপে সচেতন। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, রাত্রি যতই গভীর হইত কোথা হইতে কি জানি কিসের ভয় আসিয়া বাবার মনে এমন জমাট

বাঁধিয়া বসিত যে, ক্ষণেকের জন্যও তিনি একা থাকিতে চাহিতেন না, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে কোন একজনার নিবিড় সাহচর্য কামনা করিতেন, এমন কি আমার স্ত্রী ব্যবধান রক্ষা করিয়া শুইলে, বাবা তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া বলিতেন, এত দূরে দূরে কেন? আমিও তোমার কোলের ছেলে, তোমার মেয়েদিগকে লইয়া যেমন শুইয়া থাক, ঠিক তেমনিভাবে আমাকে জড়াইয়া ধর, আমি ঘুমাইয়া গেলেও দূরে সরিয়া যাইও না। অথচ রাত্রিকালে বাবার কাছে একা থাকিতে আমার স্ত্রীরও যেন কেমন ভয়-ভয় করিত, তিনি ঘরময় অনুভব করিতেন যেন কোন এক অশরীরী সত্তার আবির্ভাব, অলৌকিক উপস্থিতির অলক্ষ্য পদ-সঞ্চার। এই কারণে তিনি যতক্ষণ বাবার নিকট থাকিতেন শিশু-কন্যাসহ আমাকে তাঁহার দৃষ্টি-সীমাতেই অবস্থান করিতে হইত।

সেদিন রাত্রিবেলায় জাগিয়া থাকিতে থাকিতে কখন যে তন্দ্রা আকর্ষণ হইয়াছে, কখন যে বাবার পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না। সহসা বাবার ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; দেখি, তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া দ্বারের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। আমি উঠিয়া বসিতেই তিনি বলিলেন, সে এইমাত্র আসিয়াছিল—কিন্তু ভিন্নরূপে, সমস্ত ঘরখানা আজ তাহার জ্যোতিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। আমি তাহাকে শান্ত করিয়া পুনরায় শোয়াইলাম, কিন্তু একটু নিদ্রাকর্ষণ হইতে না হইতে বাবা আবার চকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওই—ওই সে বাহির হইয়া যাইতেছে। সেবারও তাঁহাকে সযত্নে শয্যাগ্রহণ করাইলাম এবং স্থির করিলাম, এবার আর না ঘুমাইয়া পরবর্তী আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত হইয়াই থাকিব। কিন্তু তথাপি ক্লান্তি ও অবসাদে চোখের পাতা ভারি হইয়া কখন যে আপনা হইতেই বুজিয়া আসিয়াছে বুঝিতে পারি নাই, বাবার ধাক্কায় সহসা ধড়মড়

করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখি, বাবা ঠিক তেমনি দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বিছানায় বসিয়া আছেন। আমি কতকটা আধো-তন্দ্রা অর্ধ-জাগরণ অবস্থাতেই বাবার অঙ্গুলিসঙ্কেত লক্ষ্য করিয়া কখন যে বারান্দায় বাহির হইয়াছি, বারান্দা হইতে পথে নামিয়া সোজা গঙ্গার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি, আমি কিছুই জানি না : সহসা কি যেন একটা বীভৎস শব্দে চমক ভাঙ্গিয়া গেল ; চোখ মেলিয়াও চিনিতে পারিতেছি না আমি কোথায়, বুঝিতে পারিতেছি না—আমি কি কারণে ও কেমন করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম! স্থান-কাল সম্বন্ধে ধীরে ধীরে চেতনা ফিরিয়া আসিল এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া মনে জাগিয়া উঠিল মুর্চ্ছাহত স্মৃতি। কিন্তু যাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আমার এই অনির্দেশ যাত্রা—তিনি কোথায়? মূঢ় আমি, মাতৃভ্রমে যে-মায়ালোকের পশ্চাতে ছুটিয়াছিলাম—অন্ধকারে তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল এবং যাইবার সময় অঞ্চল-বীজনে চঞ্চল করিয়া দিয়া গেল স্নেহের সেই একটিমাত্র সলিতার ক্ষীণ শিখাকে—যাহার স্নিগ্ধ আলোক সম্বল করিয়া তখনও আমি অন্ধকার-জীবন-পথে অগ্রসর হইতে পারিতাম! নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে জন-মনুষ্যের কোথাও চিহ্নমাত্র নাই, জীবিত প্রাণী বলিতে নির্জন পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি আমি, আর আমারই অতি নিকটের তৃণাচ্ছাদিত ছোট মাঠটিতে চরিতেছে একটি ঘোড়া। সম্ভবত তাহারই নাসিকা-শব্দে আমার তন্দ্রাঘোর ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকিবে! মনে পড়িয়া গেল বাবার কথা, তাঁহার আগ্রহ ও আশঙ্কাকুল মূর্তির কথা! তিনি যদি মূর্চ্ছিত হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গিয়া থাকেন, অথবা একাকী খোলা দরজা দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া পড়েন! বাবার নিকট ফিরিয়া যাইবার জন্ত মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু ভয় ও বিস্ময়মিশ্রিত এক অপূর্ব ভাবাবেগে দেহ এমন আড়ষ্ট

ও অবসন্ন যে, আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও পা যেন আর চলিতে চাহে না; বাড়ীমুখো হইব অথচ কিছুতেই পিছন ফিরিতে পারি না, মনে হয় পশ্চাৎ হইতে কে যেন আমার অনুসরণ করিতেছে; সেখানে অন্ধকার নৈশ-নির্জনতায় একাকী দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না, মনে হয়—কোন এক অশরীরী সঞ্চার বা অলক্ষ্য আবির্ভাব যেন আমাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রহিয়াছে। শঙ্কা ও সংস্কারের বোঝা বুক হইতে যথাসম্ভব দূরে সরাইয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম; দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, বাবা বিস্ফারিত দুই চোখের দৃষ্টি দরজার দিকে প্রসারিত করিয়া বিছানার উপর তেমনি বসিয়া আছেন আর আমার স্ত্রী শিশুকন্যাকে বুকে লইয়া তেমনি অঘোরে নিদ্রিত! আমি ঘরে ঢুকিতেই বাবা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখা পাইলে কি? বলিলাম, কই না, বহুদূর ছুটিয়া গিয়াও কাহারও ধরা-ছোঁয়া পাইলাম না, কিন্তু নিজের চোখে না দেখিলেও বাবার প্রত্যক্ষ-দর্শনকে পরিহাস করিয়া অলীক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে মন সরিল না, হয়তো বা সাহসও হইল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর বাবা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্ন করিলেন, কাল বিজয়া দশমী নয়? আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই স্বগতকণ্ঠে বলিলেন, কি জানি সে সৌভাগ্য কি আমার হইবে?

বাবা যে-সৌভাগ্যের কথা ইঙ্গিত করিতেছেন তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না, তাই বিনাবাক্যব্যয়ে সে অপ্রিয় প্রসঙ্গ একেবারে চাপিয়া গেলাম। পরের দিন বিজয়া দশমী: পূর্বদিন রাত্রিতে যে দুর্লভ সৌভাগ্যলাভ সম্বন্ধে আন্তরিকভাবে আশা পোষণ করিয়াও তাহার সার্থকতা বিষয়ে বাবা আশঙ্কা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই—বিসর্জনের পবিত্র ক্ষণটি আসিয়া সমুপস্থিত হইল তাহারই বাঞ্ছিত আশীর্বাদ হাতে লইয়া: চারিদিকে বিসর্জনের করুণ বাদ্য যখন বাজিয়া উঠিয়াছে,

ঠিক এমনি সময়ে সমবেত সকলের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে পিতার জীবন-দীপ সহসা নির্বাপিত হইয়া গেল। দেবীহীন বেদিকার বুকে বিষাদের যে ম্লান ছায়া আপনাকে আস্তৃত করিয়াছে সূয পাটে নামিবার বহুপূর্বেই গোধূলির গাঢ়তর ধূসর ছায়ারূপে, তাহা নামিয়া আসিল আমার জীবন আকাশে ও গৃহের আঙ্গিনায়। অদূরে গঙ্গাগর্ভে প্রতিমা-নিরঞ্জনের বিপুল আয়োজন চলিতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে পিতার শ্মশান-চিতার প্রদীপ জ্বালিয়া জগজ্জননার শেষ আরতি সম্পন্ন করিলাম।

একুশ

নিজ বাসভূমে পরবাসী

গৃহে ফিরিবার পরের দিনের ঘটনা: আমি বাইরের বারান্দায় বসিয়া আছি এমন সময়ে আমারই এক নিকট প্রতিবেশী ও বন্ধুর নয়-দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র আসিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইল এবং কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থা্কিবার পর সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি রামদের বাড়ীতে আসিয়াছেন? বলিয়া রাখা প্রয়োজন, রাম আমার ভাগিনেয়, ও তাহারই সমবয়স্ক ও সহপাঠী বন্ধু। আমি তাহার প্রশ্নের জবাবে জানাইলাম যে, আমি রামদের আত্মীয় ও তাহাদেরই বাড়ীতে অতিথি। বালকটি প্রশ্ন করিল, আপনি রামের দাদা-মহাশয়কে চেনেন? বলা বাহুল্য, রামের দাদামহাশয় আমার বাবা; তাহার প্রশ্নের জবাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ছেলেটী আমার হাতে কিছুটা নস্য ও কয়েক আনা পয়সা দিয়া জানিতে চাহিল, এই নস্যি ও পয়সা কয়টা রামের দাদা-মহাশয়ের হাতে আমি দিতে পারিব কিনা! অতি কষ্টে হাসি সম্বরণ

করিয়া বলিলাম, দিয়া যাও, তিনি বাড়ী ফিরিলে তাঁহার হাতে দিতে চেষ্টা করিব। বাবা বাড়ী আসিলে, নস্য ও পয়সা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম, ননী অধিকারীর ছেলে লালু ইহা রামের দাদামশায়ের হাতে দিতে বলিয়া গিয়াছে। কথার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টি লইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং ব্যাপারটা আনু-পূর্বিক শুনিবার পর সহাস্যে বলিলেন, লালুর কাছে আমি যদি তোমার পিতা হিসাবে পরিচিত না হইয়া রামের দাদামহাশয়রূপেই পরিচিত হইয়া থাকি তাহার জন্য লালুকে দোষ দেওয়া চলে না, সে দোষ তোমার কর্মের আর আমার অদৃষ্টের। কথাটা খুবই সত্য: কর্মের আকর্ষণে যখন সমাজ ও পরিবারজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হই, লালু তখন শিশুমাত্র, কাজেই জীবনে প্রথমবার দেখিয়া সে যদি আমাকে রামদের দূর সম্পর্কীয় কোন এক আত্মীয় বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে তাহা হইলে সে সুবোধ বালকের মতই কাজ করিয়াছে বলিতে হইবে।

নিজ বাসভূমে পরবাসীরূপে গণ্য হওয়া নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক, কিন্তু তদপেক্ষা মর্মান্তিকভাবে পীড়িত করিয়া তুলিল স্বগৃহে অন্তরীন অবস্থার অসহনীয়তা। জিয়াগঞ্জের মাঠ-ঘাট ও কানন-প্রান্তরের নৈশ নির্জনতা ও দিবা-সৌন্দর্য আমাকে অহরহ আকর্ষণ করিতেছে। জিয়াগঞ্জের বহু বিস্তীর্ণ বন্ধু ও বান্ধব-সমাজ আমাকে আহ্বান জানাইতেছে, অথচ আমি আড়ষ্ট ও অসহায়; আমার দিনের বিচরণসীমা সঙ্কীর্ণ, প্রকৃতির নৈশ-রূপের দর্শনলাভ আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। দিনে ও রাত্রে, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় জিয়াগঞ্জকে বেষ্টন করিয়া যে সৌন্দর্য লীলায়িত তাহার প্রতিটি তরঙ্গের সহিত আমার দীর্ঘ দিনব্যাপী অন্তরঙ্গ পরিচয়, সে সৌন্দর্য অতৃপ্ত অন্তর দিয়া আমি আকণ্ঠ পান করিয়াছি! বর্ষার গঙ্গা যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিত, কতদিন গভীর রাত্রিতে গিয়া আমি খেয়া নৌকায়

উঠিয়া বসিয়াছি এবং নৌকা পারের জন্ম যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে কূল ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শয়নলাভ করিয়াছি হালের এক পার্শ্বে ও মাঝির পদপ্রান্তে! পারাপাররত নৌকার সম্মুখে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে ভাঙ্গিয়া-পড়া ঢেউগুলির আঘাতে বাজিয়া উঠিত তল-তল ছল-ছল শব্দ, তাহারই সহিত তাল রক্ষা করিয়া হাল ও দাঁড় উঠিত এবং পড়িত নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে; জলতরঙ্গের বিচিত্র সঙ্গীতে চোখে নামিয়া আসিত স্বপ্নের ঘোর, শোণিতে মিশিয়া আসিত নেশার আমেজ। নদীর দুই তীরবর্ত্তী নিদ্রিত নগরীর সর্বাঙ্গ ছাইয়া ছড়াইয়া পড়িত জ্যোৎস্নার আলো, সে আলো শতধারে ঝরিয়া পড়িত ভরা নদার বিস্তীর্ণ বুকে, ঢেউগুলির চূড়ায় চূড়ায় তাহা ঠিকরিয়া পড়িত চূর্ণ হীরকখণ্ডের মত। এপার হইতে পরপারগামী গাড়োয়ানের আহ্বান, ওপার হইতে খেয়া নৌকার মাঝির জবাব, নিশীথ সমীরে ক্বচিত কোথা হইতে ভাসিয়া-আসা গানের রেশ, ক্বচিৎ কোথা হইতে বহিয়া-আসা বাঁশীর সুর—সব কিছু একত্রে মিলিয়া যে অপূর্ব পরিবেশ রচনা করিত—মনে হইত তাহা যেন মাটির নয়, মনে হইত তাহা যেন অচেনা এক স্বপ্নরাজ্য। কবির মানস-পটে অঙ্কিত তাহা যেন কাব্যের কল্প-লোক। নৌকা হইতে যখন তীরে নামিতাম—রাত্রির তখন প্রায় শেষ যাম; পথের দুইধারের শাখা-পল্লব জোছনার আলোতে পথের বুকে যে ছায়া ফেলিয়াছে—মনে হইত তাহা যেন কোন দেববালার সদ্য-রচিত আলিম্পন, পথের বুকে পা ফেলিয়া হাঁটিতে মন চাহিত না, ভয় হইত, পায়ের আঘাতে পাছে সে আলিপনা মুছিয়া যায়, পাছে তাহার নিম্ন হইতে ভগ্নপ্রায় পথের জীর্ণ অস্থি-কঙ্কাল বাহির হইয়া আসিয়া কদর্যতার আঘাতে সৌন্দর্যের সুকুমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চুর করিয়া দেয়! গ্রীষ্ম ও বসন্তের জ্যোৎস্না-নিশীথে বিস্তীর্ণ বালুচরের বুকে বসিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি নদী-তীরের আর-এক অপূর্ব মূর্ত্তি।

প্রতি রজনীর নৈশ-বিহারের জন্য নৌকার মাঝিরা যেমন আমাকে তাহাদের আপনজন হিসাবে বরণ করিয়া লইয়াছিল, চরের অদূরবর্তী শ্মশানচারী কুকুরও তেমনি আমাকে আর আগন্তুক মনে করিত না। রাত্রিকালে বালুচরে আমি যতক্ষণ বসিয়া থাকিতাম, একটি কুকুর প্রায়ই আসিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিত এবং যতক্ষণ সেখানে থাকিতাম, নিঃশব্দে সে আমার পাশে বসিয়া রহিত। বাড়ী ফিরিবার সময় কিছুদূর আমার অনুগমন করিয়া আবার সে ফিরিয়া যাইত শ্মশানের অভিমুখে। একদিন কি জানি কি মনে করিয়া সে-নিয়মের সে ব্যতিক্রম ঘটাইল। কুকুরটি মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া না গিয়া বরাবর আমার অনুসরণ করিতে লাগিল এবং সেই যে সে আমার পিছু লইল—ভৎ'সনা ও ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও সে তাহা হইতে বিরত হইল না। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া আসিতাম; দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিবামাত্র খোলা দ্বারপথে সেও ঘরে প্রবেশ করিল। শ্মশানচারী কুকুর জানিয়া বাড়ীর লোকজন তাহাকে অমঙ্গল ও অভিশাপজ্ঞানে তাড়াইতে উদ্যত হইলে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলাম, যে কুকুরের জন্য যুধিষ্ঠির স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য ঘর ছাড়িতে আমি ইতস্তত:করিব না; যুধিষ্ঠিরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিলাম :

"সর্বজীবে ভগবান করিছেন অধিষ্ঠান
শ্বান বলি ত্যজিব কেমনে!"

কিন্তু যাহার জন্য ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইতে আমি প্রস্তুত, মাত্র তিনটি দিনের বেশী তাহাকে গৃহ-পরিবেশের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না; একদা যেমন অনাহুতভাবে সে আসিয়াছিল, চতুর্থ দিনে তেমনি আচম্বিতেই সে চলিয়া গেল। শ্মশান-ভৈরবের নৈশ-অনুচর

বিদায় লইল বটে, কিন্তু যাইবার সময় বক্রদৃষ্টিতে হানিয়া গেল গৃহপালিত এই জীবের পোষমানা জীবনের প্রতি রূঢ় বিদ্রূপ ; ঘর-ছাড়া যে-আহ্বান লইয়া যে আমার আলয়ে আসিয়াছিল—সর্বান্তঃকরণে তাহাতে সাড়া দিবার মত সামর্থ আমার কোথায় ! মন অবশ্য ঘরে বাসা বাঁধিতেও চায় না, তাই বলিয়া শ্মশান-সার করিতেও তো সে প্রস্তুত নয় ; তাই সংসার ও শ্মশানের মাঝখানে ঘড়ির দোলকের মত সে অহরহ দোল খাইয়া কখনও স্পর্শ করিয়াছে এক প্রান্ত এবং কখনও বা সেখান হইতে ঠিকরিয়া আসিয়া চকিতে চুম্বন করিয়াছে অপর প্রান্ত। অহরহ ধ্বনিত হৃদ্‌স্পন্দনে জীবন-দোলার এই আন্দোলনেরই বিচিত্র কাব্য-ছন্দ আজও শুনিতে পাই।

কেবলই কি নৈশ-বিহার ! বিনিদ্র চোখে জাগিয়া বসিয়া কতদিন রাতের পৃথিবীর রঙ ফিরিতে দেখিয়াছি ; দেখিয়াছি—চাঁদের আলোর রূপার কাঠির স্পর্শে ঘুমাইয়া-পড়া পৃথিবীকে, ভোরের আলোয় সোনার কাঠির ছোঁয়ায় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিতে। অতি প্রত্যূষে যখন পথে বাহির হইতাম, রাত্রির শিশির-সম্পাতে পথের ধুলা তখনও ভিজিয়া ভারী হইয়া রহিয়াছে। তখনও পত্র-পল্লবে ধ্বনিত হইতেছে ঝরিয়া-পড়া নীহার-নূপুরের টুপুর-টুপুর শব্দ। শিউলী-বকুল-কনকচাঁপা ও স্থলপদ্মে অঞ্জলি ভরিয়া যেই অর্ঘ দিতাম রূপ-প্রতিমার পদপ্রান্তে, উষার ললিত কপোলে অমনি ফুটিয়া উঠিত লাজ-অরুণিমার লোহিত-রাগ। জৈন মন্দির 'দাদা-থান' ছিল আমার মধ্যাহ্নের বিরাম-কুঞ্জ : পুকুরের জল পদ্মফুলে ফুলময়, ফুলে ফুলে মত্ত মধুপদলের অশ্রান্ত গুঞ্জরণ, চতুর্দিকের কাননে-প্রান্তরে বিচিত্র বিহগ-রাজির কূজন-কাকলী—তাহারই মাঝখানে পুষ্করিণীর বাঁধা-ঘাটে উপবিষ্ট একা আমি ; চতুর্দিক হইতে উত্থিত ঐক্যতান সঙ্গীতের, চারিদিক হইতে উৎসারিত সৌন্দর্য-সম্ভারের দ্রষ্টা ও ভোক্তা বলিতে আমি ছাড়া আর কেহ কোথা নাই।

কিন্তু জিয়াগঞ্জ কেবলই কি আমার কাব্যের কমল-বন, কবিতার কল্প-লোক? তথাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি, স্বদেশ ও সমাজ প্রতিটি ক্ষেত্রের কর্মতৎপরতার সহিত আমি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভ্রূণস্থ শিশু যেমন শত শিরা-উপশিরার মাধ্যমে মাতার জীবনধারার সহিত আপন সত্তার সংযোগ রক্ষা করে, আমিও তেমনি কর্ম ও চিন্তা, শিক্ষা ও সাধনার শতবিধ সূত্রে জিয়াগঞ্জের সমাজ-জীবনের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত। তাই জিয়াগঞ্জে বাস করিব, অথচ সরকারী অনুশাসনের বলে সে যোগসূত্র বিকল ও বিচ্ছিন্ন রহিবে, জীবনের মূল মাটি হইতে প্রাণ-রস আহরণ না করিয়া টবের শোভা বর্ধন করিয়া কোনরূপে বাঁচিয়া রহিবে মাত্র—এ কথা কল্পনা করিতেও আমার সমগ্র সত্তা কুণ্ঠিত হইতেছিল।

সেদিনের সমাজ ও রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-জীবনের প্রাণকেন্দ্র যে দুইটি স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাদের একটী বন্ধুবর দেবেন বাগের জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় গৃহের ভাঙ্গা ছাদ এবং অপরটী জগৎসিং লোঢ়ার বাগানের পতনোন্মুখ পুরাতন কক্ষ—তাহারই মধ্যস্থ অনতিপ্রশস্ত মাঠ ও সেই মাঠেরই বুকে নির্মিত 'প্রফুল্লমঞ্চ' নামক বাঁশের একটি অতিসাধারণ মাচা। তাহাদের আসঙ্গ-লিপ্সার দুর্নিবার আকর্ষণ প্রতি মুহূর্তে অন্তর দিয়া অনুভব করিতাম। এই দুইটি স্থান তাহাদের নিজেদের বুকে স্থানীয় সাধনার হোমকুণ্ড রচনা করিয়াছে। এই দুইটি ব্যক্তি ইন্ধনরূপে তাহাদের সর্বস্ব অর্পণ করিয়া সে হোমানল অনির্বাণ রাখিয়াছে। জিয়াগঞ্জের উত্তরপুরুষগণ সকৃতজ্ঞ অন্তরে সে ইতিহাস স্মরণ করিবে কিনা জানি না, তবে সেদিনের সাধনযজ্ঞের যাঁহারা হোতা ও সমিধবাহী, সেদিনের সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিক জীবন গঠনের যাঁহারা সাধক ও শিল্পী—এই দুইটি স্থান ও ব্যক্তির অবদান তাঁহাদের জীবনে অবিস্মরণীয়। সেদিনের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আশ্রয় পাইয়াছে, কিন্তু সেদিনের স্মৃতি আজও অনপনেয় অক্ষরে মনের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

বাইশ

খেপার খেয়াল

ভূতগ্রস্থ ব্যক্তির মত যখন এমনি করিয়া দিনে ও রাতে জিয়াগঞ্জের পথে-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, সেই সময়ে একদিনের একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল:

তখনো ঠিক ভোর হয় নাই, পথ ঘাট ও ঘর বাড়ী তখনও তরল আঁধারে আচ্ছন্ন রহিয়া স্বপ্ন-দৃষ্ট রহস্যরাজ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ভট্টপাড়ার ব্রীজে বিহার করিবার উদ্দেশ্যে আমি সবেমাত্র বড়কুঠির মোড় ফিরিয়াছি এমন সময় দেখি, বিপরীত দিক হইতে এক অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তি আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। নিকটবর্তী হইলে চিনিলাম, সে মনুষ্যমূর্তি আর কেহ নয় বেগমগঞ্জের পাগলা জগৎ ঘোষ: সবিস্ময়ে সে আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া আছে, যেন বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে না এমন অসময়ে একা পথে বাহির হইবার মত পাগল সে ছাড়া পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি থাকিতে পারে। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন আমার ছবি তাহার চোখে প্রতিফলিত হয় নাই, যেন আমার পরিচয় তাহার চেতনাকে স্পর্শ করে নাই। মুহূর্ত পরে সে মোহভাব কাটিয়া গেল, স্মিতহাস্য ফুটিয়া উঠিল তাহার বিশীর্ণ অধরপ্রান্তে, ভক্তি-গদ-গদ-চিত্তে প্রণাম করিয়া অভ্যাস-মত সে আমার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং তাহার পরেই যে কাব সে করিয়া বসিল তাহা পাগল ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব:

জগৎ ঘোষ আরও একটু নিকটস্থ হইয়া বিশ্বস্ততার চাপা কণ্ঠে প্রায়

আমার কানের কাছে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল, কিন্তু এই সময় চেঁচাইয়া পাড়ার লোক জাগাইয়া যদি আমি বলি, ওগো, সবাই আসিয়া দেখিয়া যান কংগ্রেসের নেতা সারা রাত্রি অস্থানে কাটাইয়া ভোরের আঁধারে গা ঢাকা দিয়া চম্পট দিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে কেমন মজাটা হয় !

সভক্তি প্রণাম লাভের অব্যবহিত পরেই এমন নিদারুণ প্রমাদে পড়িবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না, তাই প্রথমটা কেমন যেন একটু ভেবা-চেকা খাইয়া গিয়াছিলাম ; কিন্তু পরক্ষণে মোহভাব হইতে মুক্ত হইয়া ক্রোধে দিশেহারা হইবার উপক্রম হইলাম। ইচ্ছা হইল গালে একটি বিরাশি সিক্কা ওজনের চপেটাঘাত করিয়া শিখাইয়া দিই যে, পাগলামীরও একটা সীমা থাকা উচিত ; কিন্তু তাহার মানসিক বৈকল্যের কথা স্মরণ করিয়া অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিলাম এবং যথাসম্ভব শান্ত ও সংযত কণ্ঠে বলিলাম, একবার চেঁচাইয়া দেখ তাহার ফল কি হয় : আমি তোমাকে পাগল বলিয়া এতক্ষণ পর্যন্ত কিছু বলি নাই বটে, কিন্তু তোমার চিৎকারে পাড়ার ভদ্রলোকেরা যদি জাগিয়া উঠেন তাহা হইলে পাগলামীর মহৌষধ তোমার উপর প্রয়োগ না করিয়া তাঁহারা ছাড়িবেন না। দেখিলাম, আমার কথা কয়টি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখের ও মুখের চেহারা বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

পরক্ষণেই পুনরায় প্রণত হইয়া ও পদধূলি লইয়া বলিতে লাগিল, দেখুন দেব্‌তা, এমন কথা কি আমি বলিতে পারি, না আপনার সম্বন্ধে সে কথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে। একটু তামাসা করিলাম মাত্র, আর তাহা ছাড়া, সারা রাত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভোরের দিকে চায়ের একটু তেষ্টা পাইয়াছে, যদি দুটো পয়সা দিতেন !

তাহার ভাব-গতিক এবং পরিহাস ও প্রস্তাবের বহর দেখিয়া অবাক

হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তাহা হইলে পাগ্‌লা জগৎ ঘোষও দেখিতেছি ব্লাক-মেইলিং জানে, জানে কেমন করিয়া কেলেঙ্কারীর ভয় দেখাইয়া সম্মানী লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে হয়! পয়সা আমি তখনই তাহাকে দিতাম, কিন্তু পাছে পাগল তাহার দুষ্টবুদ্ধির বশে ভাবিয়া বসে যে, নেহাৎ বেকায়দায় পড়িয়াই আমি তাহাকে পয়সা কয়টা ঘুষ দিতে বাধ্য হইলাম, এই মনে করিয়া বলিলাম, চায়ের দোকান এখনও খোলে নাই, তুমি বাজারে ইন্দিরের দোকানের সামনে অপেক্ষা কর, ফিরিয়া আসিয়া পয়সা দিতেছি।

প্রাতঃভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি, পাগল তখনও যথাস্থানেই বসিয়া আছে। তাহার হাতে পয়সা এক আনা দিয়া বলিলাম, কেমন ঘোষের পো, এইবারে সেই কথাটা সকলের সামনে খুলিয়া বলি। জগৎ ঘোষ তাহার জবাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তিভরে পদধূলি গ্রহণ করিল এবং ভাঙ্গা ও বেসুরো গলায় আমার যে-স্তুতি গাহিতে লাগিল তাহা শুনিলে দেবতারাও গলিয়া যান, মানুষ কোন্ ছার!

এক পাগলের কথা বলিতে গিয়া আর এক পাগলের কথা মনে পড়িয়া গেল:

বহরমপুর জেলে এক পাগলের সাক্ষাৎ মিলিয়াছিল, তাহার নাম শীতলা। সে কলিকাতায় কোন এক সাহেবের দোকানে চাকরী করিত; একদিন কথায় কথায় মাথা বিগড়াইয়া সে মনিবকে মারিয়া বসে এবং সেই অপরাধে তাহার জেল হয়। এখন পাগল হইয়াই সে সাহেবকে মারিয়াছিল, না সাহেবকে মারিয়া জেলে আসিবার পরই সে পাগল হইয়াছিল—তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন। এই দেখুন—কথা কেমন করিয়া কথাকে আশ্রয় করিয়া এক কথা হইতে কথান্তরে লতাইয়া

চলে! আমার ওই ওপরের কথাটি বলিবার ঢঙ হইতে আমাদেরই নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু-মহলের আর একটি মজার ঘটনা স্মরণ হইল :

সৈনিক-সম্পাদক গৌতম সেন মহাশয়ের কবিরাজখানা তখন জিয়াগঞ্জের বেগমগঞ্জ মহল্লায় অবস্থিত। কবিরাজখানায় ভেষজ-বিজ্ঞানের আদৌ কোন বালাই ছিল না বলিলে ভুল বলা হইবে, তাহা অবশ্যই ছিল, কিন্তু ছিল গৌণ আকারে এবং মুখ্যত তাহা ছিল সাহিত্য-বাসর। সে-বাসরে সেদিনের হরগোবিন্দ সেনের বুকে শোনা যাইতেছে জাগরণোন্মুখ আজিকার গৌতম সেনের পক্ষ-ঝাপটের সুস্পষ্ট শব্দ। সেদিনের বগলার তরুণ কণ্ঠের কাকলী-ছন্দে কথা কহিতে চাহিতেছে আজিকার বিধায়ক। সেই আমরাই আজ আবার আসিয়া মিলিত হইয়াছি এক বৃহত্তর সাহিত্য-বাসরে; কিন্তু হায়, এ বাসরে প্রতিষ্ঠা আছে বটে, কিন্তু প্রাণ কোথায়, অর্থ আছে কিন্তু অন্তর কোথায়, উদ্যম আছে কিন্তু সে উচ্ছ্বাস কোথায়! মাঝে মাঝে মনে হয়, আজ যদি আমরা মহানগরীর এই বিলাস-বিপণি হইতে বিদায় লইয়া আবার সেই নিভৃত পল্লী-নিকেতনে ফিরিয়া যাই, চিরপরিচিত প্রাচীন সেই পরিবেশ এই আগন্তুকগণকে চিনিতে পারিবে কি! অতীতের সেই হারানো-দিনের দিবাস্বপ্নগুলি আমরা পুনরায় ফিরিয়া পাইব কি?

কিন্তু কথায় কথায় বিষয়বস্তু হইতে বহু দূরে সরিয়া আসিয়াছি। সেদিন দোল-পূর্ণিমা; গৌতম সেন মহাশয়ের কবিরাজখানায় বসিয়াই বন্ধুগণ প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধি-সেবনের পর পথে বাহির হইলেন। বন্ধুবর দেবেন সাহার অবস্থা তখন বিশেষভাবে কাহিল : কিছুদূর আসিয়াই তিনি এক গলির মোড়ে মূত্রত্যাগ করিতে বসিবামাত্র সভয়ে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, তাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে।

ছুটিয়া নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া আবিষ্কার করিলাম, শালপাতার তাড়া

বাঁধিবার একটি কঞ্চির বেষ্টনী তথায় পড়িয়া আছে এবং বন্ধুবর দেবেন-বাবুকে তাহা দেখাইয়া বুঝাইতে চাহিলাম যে, হয়তো এই কঞ্চির একমুখে তাঁহার পা পড়িবামাত্র অন্য মুখটি উত্থিত হইয়া তাঁহার পায়ে আঘাত করিয়া থাকিবে এবং সেই আঘাতকেই সম্ভবত তাহার ধারণা হইয়া থাকিবে সর্পদংশনরূপে। কিন্তু তথাপি তিনি আশ্বস্ত না হইয়া স্বগতকণ্ঠে অনবরত বলিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু আমাকে কি সাপেই কামড়ালো ! বার বার একই কথা শুনিতে শুনিতে উত্যক্ত হইয়া আমি বলিয়া বসিলাম, না কামড়িয়েই সাপলো ! কথাটা শুনিবামাত্র বন্ধুবর দেবেনবাবুর নেশা মুহূর্তে ছুটিয়া গেল এবং ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কামড়াইয়া সাপিল কি রকম ? তেমনি গম্ভীরভাবেই আমি বলিলাম, তা কামড়াইয়া সাপিতে পারে বই কি, সাপে যদি কামড়াইতে পারে—কামড়াইয়া সাপিতে আপত্তি কোথায় ! 'আমাকে সাপেই কামড়াইল, না কামড়াইয়াই সাপিল'—এই কথা কয়টি ক্রন্দনের সুরে গাহিতে গাহিতে দেবেনবাবু পথ চলিতে লাগিলেন।

শীতলা খেপা পাগল হইয়া সাহেব মারিল, না সাহেব মারিবার ফলে জেলে আসিয়া পাগল হইল—এই কথা বলিতে গিয়া অতি পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় এই ঘটনার অবতারণা। শীতলা দুর্দান্ত পাগল, কাজেই প্রহরী পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাহাকে রোজ বিকালের দিকে সেলের বাহিরে আনিয়া বসাইয়া রাখা হইত। একদিন তাহার নিকট দিয়া যাইতেছি—এমন সময় সে আমাকে ডাকিয়া বলিল, এই স্বদেশী বাবু, এক বাত পুঁছেগা—জবাব দোওগে ? আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। শীতলা পূব আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, উয়া দেখো ! দিনকা বখৎ চন্দ্রমা দেখলাই পড়তা, আব বাতাও, রাতকা বখৎ সুরুয কেঁও নেহি দিখলাই পড়তা ?

প্রশ্ন খুবই দুরূহ এবং প্রশ্নকর্তা অতিশয় দুর্জন, তাই সাবধানে জবাব

দিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, যদিও আমরা দেখিতে পাইনা—তথাপি রাত্রিকালেও আকাশে সূর্য থাকে এবং তাহা দেখে অন্য আর এক দেশের লোক। ভাব-গতিক দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার উত্তর শাত্‌লার মনঃপূত হইতেছে না, কিন্তু তাহার জন্য সে যে আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে চাহিবে তাহা আমি ধারণাও করিতে পারি নাই: তেরি স্বদেশী বাবুকা কুছ কহা হ্যায়—এই কথা কয়টি কণ্ঠে লইয়াই সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া লম্ফপ্রদান করিল, কিন্তু ওয়ার্ডারগণ মধ্য পথে তাহাকে ধরিয়া ফেলায় আমার সহিত তাহার মোলাকাত হইল না।

আর এক দিনের ঘটনা: ঠিক সেইস্থানে এবং সেই সময়ে নিকট দিয়া আমাকে যাইতে দেখিয়া শাত্‌লা আমাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল আর এক প্রশ্ন: সূচনায় পূর্বদিনের মতই গৌর-চন্দ্রিকা করিয়া বলিল, এই স্বদেশী বাবু, এক বাৎ পুঁছেগা, জবাব দেগা? সেদিনের মতই ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলে সে বলিল, তুম্ লোগ ইংরেইজকা সাথ কেঁউ লড়তে হো—বাতলাও তো সহি? বুঝিলাম, সিপাহিদের কাছে শীত্‌লা হয়তো শুনিয়া থাকিবে, আমরা স্বদেশীবাবু এবং ইংরাজদের সহিত লড়াই করাই আমাদের পেশা। তবু পূর্বদিনের কথা স্মরণ করিয়া নিরাপদ ব্যবধানে সরিয়া দাঁড়াইলাম এবং যথাসম্ভব সতর্কতা সহকারে ও সন্তোষজনকভাবে উত্তর দিবার উদ্দেশ্যে যেই বলিয়াছি, ইংরাজরা আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে কিনা তাই...... অমনি আমার কথা শেষ হইবার পূর্বেই ব্যাঘ্রবিক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ও দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া সে বলিতে লাগিল, ওঃ—উস্‌কা বাপ্‌কা রাজ ছিন্ লিয়া! রাজ ছিন লিয়া তো লড়নেকো ক্যেয়া মতলব, আদালতমে যাও, নালিশ করো!

আমি সভয়ে মাথা নাড়িয়া অমূল্য সে উপদেশ শিরোধার্য করিবার পক্ষে সম্মতি জানাইলাম এবং দূরতর ব্যবধানে গিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হায় শাতল! ইংরাজের সহিত লড়াই করা যে পাপ—এ বোধ তোমার হইয়াছে বটে! কিন্তু হইয়াছে একটু বিলম্বে; কিছুদিন পূর্বে এ বোধোদয় হইলে তুমি নিজে সাহেব মারিয়া জেলে আসিতে না এবং জেলে আসিবার পর নিজের মাথাটি নিঃশেষে চর্বণ করিয়া নিদারুণ এই দুর্ভোগ ভোগ করিতে না! এ চেতনা যে শুধু শাত্‌লারই হইয়াছে—তাহা নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু উগ্রতম ব্যক্তিত্বেরও দুই-একবার দাগা খাইবার পর ইহা হইতে অধিক শীতল হইয়া একদম ঠাণ্ডা মারিয়া যাইবার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নয়। পাগলা জগৎ ঘোষ ভবপারে পাড়ী জমাইয়াছে এবং শাত্‌লা পাগলও যে কোথায় কেমন আছে কে জানে! যে খেপা খেয়ালের-বশে আমার জীবনের পথে ক্ষণিকের জন্য পা দিয়া, খেয়ালের বশেই পরক্ষণে সরিয়া পড়িয়াছিল, কে জানে—জীবনের এই অবেলায় স্মরণের রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া তাহারা আবার আমার চলার পথের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইবে! জীবনের কিছুই হারায় না, স্মরণ ও বিস্মরণের আলো-ছায়াপথে আনা-গোনা করে মাত্র।

তেইশ

জীবন-নদীর ওপারে

একই কথা উচ্চারণের স্থান-কাল ও পাত্র-ভেদে ভিন্ন গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে : শীতলা খেপা যখন অপরাহ্ণ আকাশে চন্দ্রের আবির্ভাব দেখাইয়া নৈশ-গগনে সূর্যের অস্তিত্ব দৃশ্যমান না-হওয়ার হেতু দাবী করিতেছিল, আমার চোখ তখন কিন্তু কারাপ্রাচীরের অবরোধ ঠেলিয়া তৃষিত চকোরের মত চাঁদের সুধাই পান করিতেছে, মন আমার তখন তাহারই রূপের সম্বর্ধনায় কবিতার ছন্দ গুঞ্জরণ করিতেছে। শীতলার চোখ হয়তো আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়াই চাঁদের সহিত মিলিত হইয়া থাকিবে, আমার চন্দ্রাহত মনেরই চিন্তাসূত্রের খেই ধরিয়া চাঁদের প্রসঙ্গে আসিয়া হয়তো সে উপনীত হইয়া থাকিবে। শারদীয় অপরাহ্ণের সে শোভা বর্ণনা করিতে গিয়া মনে আমার ছন্দের দোলা লাগিয়াছে :

তখন তপন অস্তের পথগামী
থমকিয়া চাঁদ আধ পথে আছে থামি
ধরণীর বুকে আঁধার আসেনি নামি
অস্ফুট দুই-ই রবি-শশী কর রেখা।

আমার এই স্বগত কাব্য-গুঞ্জরণের সহিত সুর মিলাইয়া শীতলা যদি সেদিন কথা না কহিত, তাহার কথাকে হয়তো অর্থহীন প্রলাপ ভাষণ বলিয়াই উড়াইয়া দিতে পারিতাম, মন হয়তো এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া পাগলের স্মৃতি পুষিয়া রাখিতে চাহিত না এবং শীতলার স্মৃতি জীবনের আরও বহু স্মৃতির মতই জমার ঘর হইতে উৎখাত হইয়া খয়রাতির

খাতায় খরচ লেখা হইয়া যাইত। কিন্তু ক্ষেত্রের সহিত খেলোয়াড়ের সামঞ্জস্য, পরিবেশের সহিত প্রশ্নের সঙ্গতি, সঙ্গীতের সহিত সুরের মত যোজিত হইয়া চলার পথের সামান্যতম এক ঘটনাকে অসামান্য অস্তিত্ব দান করিয়াছে।

একই কথা—এক সঙ্গীত ও এক সুর কেবলমাত্র ক্ষেত্র ও পরিবেশের পার্থক্যভেদে যে ভিন্ন গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে তাহার আর একটি অধিকতর মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত আজও আমার স্মরণে সজীব হইয়া রহিয়াছে: একদিন সন্ধ্যা বেলায় লোয়া পার্কের প্রাঙ্গণমঞ্চে বসিয়া আছি এমন সময় জনৈক বন্ধু আসিয়া বাগানের এক প্রান্তে আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং কানে কানে যে সংবাদটি পরিবেশন করিলেন তাহার সার-সংক্ষেপ এই যে নাগাটা-কুঠির ম্যানেজারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার দাদার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া আফিং খাইয়াছেন, অথচ বাসায় তিনি ছাড়া পুরুষ বলিতে আর কেহ নাই. কাজেই মুমূর্ষু যুবকটিকে যদি বাঁচাইতে হয়, পুলিশের হস্তক্ষেপজনিত পীড়ন ও লাঞ্ছনা হইতে পরিবারটিকে যদি রক্ষা করিতে হয়—তাহা হইলে এই মুহূর্তে তথায় যাইয়া অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমার কর্তব্য। বলা বাহুল্য, উপস্থিত বন্ধুদের বিস্ময় ও বিরক্তি উৎপাদন করিয়া তৎক্ষণাৎ আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম এবং চিকিৎসকের নিকট ঘটনার প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রদান করিয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলাম। ডাক্তারসহ আমি যখন অকুস্থলে গিয়া উপস্থিত, অহিফেনের বিষক্রিয়া তখন যুবকটির দেহে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার অস্তিত্ব আন্দোলিত হইতেছে জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে। চিকিৎসক মুহূর্তমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া রোগীর পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং অধিক রাত্রি পর্যন্ত তথায় স্বয়ং উপস্থিত রহিয়া যখন দেখিলেন, মৃত্যুর আশঙ্কা

প্রায় নিবারিত, তিনি বাড়ী ফিরিয়া গেলেন অবশিষ্ট রাত্রিটুকু তাহাকে জাগাইয়া রাখিবার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করিয়া।

রাত্রি গভীর, চারিদিক নিস্তব্ধ এবং কক্ষে আমরা দুইটি প্রাণী ব্যতীত আর কেহ নাই; অহিফেনের মাদক-মোহে যুবকের তন্দ্রালু-চোখ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ হইয়া আসিতে চাহিতেছে, কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে গিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, আত্মহত্যার কল্পনা তাহার মনে উদিত হইল কোথা হইতে এবং তাহা হইলই বা কেন? কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর যুবকটি ব্যথাহত ও ভাবোদ্বেল কণ্ঠে বলিল, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, আপনি অবশ্য চেষ্টা করিতেছেন জীবনের ক্ষেত্রে আমাকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য, কিন্তু যদি জানিতেন, জীবন আমার পক্ষে জতু-গৃহ বিশেষ, তাহা হইলে এ চেষ্টা হইতে বিরত না হইয়া আপনি পারিতেন না। তাহার কথা এবং তাহা বলিবার ভঙ্গী আমার অন্তর স্পর্শ করিল, স্নেহ ও সহানুভূতি-মিশ্রিত কণ্ঠে আমি তাহাকে বলিলাম, কিন্তু আসল কথাটা তো এখনও বলিলে না ভাই! এই তরুণ যৌবনে জীবনের উপর তোমার এই বিতৃষ্ণা কেন? তাহার বিহ্বল ও বিচলিত ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, আমার স্নেহ ও সহানুভূতির সরস স্পর্শ তাহারও অন্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে: কণ্ঠে তখনও সঙ্কোচের আড়ষ্টতা আছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আন্তরিকতার আবেগ হইতে তাহা মুক্ত নয়; শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠে যুবক বলিল, সে কথা আপনার নিকট গোপন রাখিব না, আপনার সহৃদয়তার জন্য তো বটেই—তাহা ছাড়া আমার নিজেরও স্বার্থে সেকথা আপনার গোচরে আমাকে আনিতেই হইবে কারণ আপনার সস্নেহ সেবা-পরিচর্যা ও সযত্ন প্রয়াস স্বত্বেও যদি জীবনের পরপারে আমাকে যাত্রা করিতেই হয়—তাহা হইলে অন্তরের অকথিত

বেদনার বোঝা আমাকে বুকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে: অতঃপর হেতুর যে করুণ বিবরণ সে দাখিল করিল, তাহার মধ্যে শুনিতে পাইলাম, ব্যর্থ-প্রণয়ের হতাশার মর্মভেদী হাহাকার শব্দ। অন্য যে-কোন সময় হইলে যুবকের অসংযম ও অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে তিরস্কারে আমার কণ্ঠ হয়তো মুখর হইয়া উঠিত, কিন্তু গভীর ও নিস্তব্ধ নিশীথের সেই নির্জন পারিবেশ আমার কণ্ঠ হইতে ভৎ'সনাবাণী হরণ করিয়া, সমবেদনার দীর্ঘশ্বাসে তাহাকে ভারাতুর করিয়া ভরিয়া তুলিয়াছে। অন্তরের কথা উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিবার দৈহিক-শ্রম ও মানসিক শ্রান্তির মিলিত গুরুভারে যুবকের অবসন্ন শরীর শয্যায় লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছে, তাহার দুই চোখ ছাইয়া নামিয়া আসিতেছে মৃত্যুর মোহঘোর; জানিতাম সে সুকণ্ঠ গায়ক। তাই কোন প্রকারে তাহাকে জাগাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করিলাম একখানা গান গাহিবার। গানের কথা শুনিয়া যুবকটি চমকিয়া উঠিল, মনে হইল—ক্ষেত্র ও পরিবেশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এই প্রস্তাবের জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না; পরক্ষণেই প্রসন্নতার স্মিতহাস্যে তাহার মুখখানি প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং সে বলিতে লাগিল, সঙ্গীতের সাধনা ছাড়া জীবনে আমার আর কিছু সম্বল নাই। তাই যাত্রার পূর্ব-মুহূর্তে সে-সম্বল সুরে সুরে নৈশ-সমীরে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া যাইবার যে-প্রস্তাব আপনি করিয়াছেন—তাহা কাল ও পাত্রপোযোগীই হইয়াছে। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটি অতি মৃদু অথচ সকরুণ সুর সহসা কক্ষের মধ্যে গুঞ্জরিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহা রূপান্তরিত হইল সুস্পষ্ট সঙ্গীতে:

আমার জীবন নদীর ওপারে
এসে দাঁড়ায়ো দাঁড়ায়ো বঁধু হে!
আমি তরিটি বাহিয়া আসিব
তুমি চরণ দুখানি বাড়ায়ো হে!

বহু প্রথিতযশা গায়কের কণ্ঠে সর্বজনবিদিত বিখ্যাত বহু সঙ্গীত গীত হইতে শুনিয়াছি; এ গানটিও যে জীবনে ইতিপূর্বে আর কোন দিন শুনি নাই তাহা নয়, কিন্তু সেদিন নিশুত-রাত্রির নিস্তব্ধ গোপন অন্ধকারে যাহা শুনিলাম—তাহা তো সঙ্গীত-বিজ্ঞানসম্মত উচ্চাঙ্গের গান নয়, ব্যথাহত অন্তরের অন্তস্তল ভেদ করিয়া তাহা যেন বহিয়া-আসা বেদনার ভোগবতী প্রবাহ! মাদকতার মোহাবিষ্ট রসনার জড়িত ও অর্দ্ধস্ফুট উচ্চারণ, চলিতে চলিতে সুরের সহসা গতিপথে থমকিয়া দাঁড়ানো ও পরক্ষণে পুনরায় চমকিয়া পথ চলা, ধ্যানস্তিমিত দুই নেত্র বহিয়া বিগলিত অশ্রুধারের অশ্রান্ত বর্ষণ—সকলে মিলিয়া এমন এক অপূর্ব স্বপ্ন-মোহ রচনা করিল—স্থূল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যাহাকে মনে হইতে লাগিল নিতান্ত অলীক ও অবাস্তব। গান যখন শেষ ছত্রে আসিয়া উপনীত হইল:

'আমি আপনা হারায়ে দিশেহারা
তুমি এতটুকু হারায়ো হারায়ো বঁধু হে!

মনে হইল, কথাটির সহিত গায়কের বেদনার্ত বক্ষ যেন সকরুণসুরে শতধা বিদীর্ণ হইতে চাহিতেছে, তুফানের মধ্যে নিক্ষিপ্ত জীবন-তরণীর বিপন্ন নাবিক যেন অসহায় আর্ত-হাহাকারে নৈশ আকাশ-বাতাস ভারাতুর করিয়া তুলিয়াছে। গান শুনিতে শুনিতে কেবলই মনে হইতে লাগিল; যাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণান্ত এই আকুতি, যাঁহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে না পাইয়া জীবনের ব্যর্থতার দুর্বহ বোঝা নামাইয়া রাখিবার জন্য এই আয়োজন, জীবনের এপারে যাঁহাকে না পাইয়া পরপারে জীবন তরণীর বুকে যাঁহার চরণপাত কামনা করিয়া এই করুণ সঙ্গীত—তাঁহার আবাস-গৃহ তো অধিক দূরবর্তী নয়: মর্মন্তুদ এই দুর্ঘটনার দ্রুত তরঙ্গ বায়ুস্তর সন্তরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আহত হইতেছে কি, নিদারুণ এই শোক-

সঙ্গীতের সকরুণ সুর নৈশ-বায়ু-তরঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া তাঁহার বুকের বেতার-যন্ত্রে ধ্বনিত হইতেছে কি! সে গান সে সুর কোন সুদূর অতীতে শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রেশ তাহার আজও আমার অন্তরের বীণার তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত।

স্মরণের রুদ্ধদ্বারে দুর্ঘটনার করাঘাত শুনিয়া শোচনীয়তায় আর এক দুর্ঘটনা সুদীর্ঘ সুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছে: ক্রিয়াগঞ্জে তখনও আমাদের বর্তমান বসতবাটি খরিদ করা হয় নাই, বোসেদের বাড়ীতে তখনও আমরা ভাড়াটিয়া, বর্ষার এক বিষাদ-পাণ্ডুর অপরাহ্ণ: বৃষ্টির ধারায় বেগ নাই অথচ বিরামও নাই, বাদল-বীণার তারে তখনও অবিরাম বাজিয়া চলিয়াছে মেঘ মল্লারের রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ সুর; পথে বাহির হইবার উপায় নাই, অথচ ঘরেও মন বসিতেছে না, তাই সিঁড়িঘরের জানালার পাশে আসন পাতিয়া একেলা বসিয়া আছি মেঘ-মেদুর দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া। সহসা কোথা হইতে বহু কণ্ঠ নিসৃত কোলাহল উঠিল, চকিত হইয়া চোখ ফিরাইতেই দেখি, অদূরে রাসপাড়ার একটি বাড়ীর দোতলার বারান্দার উপর জ্বলিয়া উঠিয়াছে আগুন এবং প্রজ্বলিত আগুন স্থির প্রভায় একই স্থানে না জ্বলিয়া বারান্দার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি ছুটিয়া বেড়াইতেছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সে-আগুন বস্তু-বিশেষের গায়ে লাগে নাই, লাগিয়াছে ব্যক্তি-বিশেষের দেহে। অগ্নিকাণ্ডের স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম এবং তথায় গিয়া দেখিলাম, যে মেয়েটি পরিধেয় বস্ত্রে আগুন ধরাইয়া আত্মহত্যার জন্য উদ্যত সিঁড়ির দরজা ভাঙ্গিয়া তাহাকে বাহির করিবার চেষ্টা হইতেছে। তাহা হইলেও এবং অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইল; দুর্ঘটনার পরের দিন মেয়েটি তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দুর্ঘটনার পরিসমাপ্তি অবশ্য এইখানে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে প্রণয়ের যে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের কাহিনী, প্রেমের যে পৈশাচিক প্রত্যাখ্যানের ইতিহাস পড়িয়া রহিয়াছে—পরিধি তাহার জীবনের প্রান্ত হইতে মরণের প্রত্যন্ত-সীমা অবধি প্রসারিত :

জনৈক বাস-চালকের প্রণয়মুগ্ধ হইয়া মেয়েটি অন্য কোথা হইতে জিয়াগঞ্জ আসে এবং রাসপাড়ার ওই বাড়ীটিতে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করিতে থাকে। দুর্ঘটনার দিন দুপুর বেলায় বাস-চালক কার্য হইতে বাসায় ফিরিয়া রূঢ়কণ্ঠে মেয়েটিকে বলে, বাড়ীর বাহির হইতে আমি কি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করি নাই, তথাপি কোন সাহসে ও কাহার আকর্ষণে তুমি সে-আদেশ উপেক্ষা করিয়া গলির মোড়ে গিয়া প্রায়ই দাঁড়াইয়া থাক ?

গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিবার কালে চোখে-চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াই মেয়েটি বুঝিয়াছিল আজ তাহার ললাটে লাঞ্ছনা আছে, কিন্তু সে লাঞ্ছনার পরিণতি যে জীবন্ত অগ্নি-সংকারে গিয়া পৌছাইবে—সে-কথা সম্ভবত কল্পনাও করিতে পারে নাই। রূঢ় প্রশ্ন শুনিয়াও দ্বিধা-সঙ্কুচিত ও ভয়ত্রস্ত অন্তরে সে নীরব।

মেয়েটিকে মৌন থাকিতে দেখিয়া ড্রাইভার পুনরায় বলিল, অমন চুপ করিয়া থাকা চলিবে না, যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহার স্পষ্ট জবাব চাই : পথের বাহির হইতে না দিয়া তোমাকে যে মান ও মর্যাদা আমি দিতে চাই—জানি, তুমি তাহার যোগ্য নও, কিন্তু জানিতে চাই আমার স্কন্ধে আরূঢ় রহিয়া তুমি ছুটিয়া পথে বাহির হও কাহার আকর্ষণে ?

মেয়েটী এতক্ষণে মুখ খুলিল, সে বলিল, কাহার আকর্ষণে যে পথে বাহির হই সে কথা আগেও তোমাকে বলিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাস কর নাই ; আজ আবার বলিতেছি শোন : ভোর হইতে না হইতে তুমি বাস

লইয়া কাজে বাহির হইয়া যাও, দুপুরের খাওয়ার জন্য কোন দিন বাসায় ফের, কোনদিন বা ফেরও না অথচ সারাদিন এই নির্জন ঘরে আমি একলাটী বসিয়া থাকি, গভীর রাত্রে তুমি কখন গৃহে ফিরিবে তাহারই প্রতীক্ষায়; সারাটা দিন তোমাকে দেখিবার জন্য প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে, কিন্তু তুমি কোথায়! এত বাসের মধ্যে তোমার বাসের হর্ণ আমি চিনি, তাই যখনই মজুমদারের বাড়ীর কাছে তোমার গাড়ীর হর্ণের আওয়াজ পাই, ছুটিয়া গিয়া গলির মোড়ে দাঁড়াই, বাসের চলার পথে চকিতে যদি তোমাকে একবার দেখিতে পাই এই আশায়। ড্রাইভারের মন প্রত্যয় মানিল না, প্রণয় এবং পাত্রয়ের প্রতি রূঢ় বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মেয়েটি তাহার দুই পা ছাঁদিয়া ধরিয়া বেদনা-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল; আমার কথায় বিশ্বাস না কর, ক্ষুধার সময় মুখের আহার ফেলিয়া যাইও না! রোষে ও নেশায় উন্মত্ত ড্রাইভার তাহাকে পদাঘাত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত: প্রত্যাখ্যাত ও পদাহত প্রেমের পক্ষে পাবকের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না। মুমূর্ষু মেয়েটি শিয়রে বসিয়া পুলিশ যখন তাহার প্রতি লোকটির আচরণ সম্বন্ধে মৃত্যু-কালীন জবানবন্দী গ্রহণ করিতেছে, উত্তরে সে বলে, সে আমাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে, তাহার কোন দোষ নাই; সব দোষ আমার এই হতভাগীর দুর্বুদ্ধির। যে শেষ কথাটি রসনায় লইয়া সে জীবনের পরপারে যাত্রা করিল তাহা স্পষ্টত মিথ্যা: মানুষের বিচারের মানদণ্ডে সে-মিথ্যা কি মূল্য বহন করিল জানিনা, কিন্তু ন্যায়ের নিক্তিতে যেখানে যাচাই হয় শুধু অন্তরের মহামূল্য, এই মিথ্যা যখন বহ্নিদগ্ধ স্বর্ণের মত তাহার পাবকপরিশুদ্ধ দিব্যকান্তি হইয়া সে বিচার সভায় দণ্ডায়মান হইবে, অবিমিশ্র সত্যের সারি তাহার সম্বর্ধনায় সসম্ভ্রমে শির না নোয়াইয়া পারিবে কি?

চব্বিশ

মনোহীনের মনস্তত্ত্ব

পাগলের প্রসঙ্গে পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিতে হইল, বিশেষ করিয়া ক্ষেপা জগৎ ঘোষের জন্য আবার জেলে না আসিয়া উপায় রহিল না। মনে প্রশ্ন জাগিল, আপ্যায়নের আরও হাজার কথা থাকিতে সেদিন প্রত্যূষে পথে আমাকে দেখিয়া জগৎ ঘোষের মনে সহসা 'অস্থানের' কথা জাগিয়া উঠিল কেন? কেবলই মনে হইতে লাগিল, পাগলের কি কোন মনস্তত্ত্ব আছে? পাগলের মনে যে-কথা উদিত হয়, তাহা কি একেবারে অহেতুক ও আকস্মিক, অথবা প্রাসঙ্গিক কোন ঘটনায় তাহা আঘাতের ফল? ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িয়া গেল দমদম সেন্ট্রাল জেলের এক যুবক রাজনৈতিক বন্দীর কথা: আগষ্ট আন্দোলনের বন্দী হিসাবে আমরা দমদম জেলের অধিবাসী, কলিকাতার বাসিন্দা একটি ছেলে তখন সেই সূত্রেই সে জেলের বন্দীরূপে বাস করিতেছে। সুন্দর চেহারা, ব্যায়াম-সুগঠিত দেহ, বিনয়ী ও অমায়িক চরিত্রের সেই ছেলেটি তাহার আচরণের জন্য জেলখানার এক জনপ্রিয় ব্যক্তি। ধীরে ধীরে তাহার সদাপ্রফুল্ল সহাস্যমুখে নামিয়া আসিতে লাগিল অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও গভীর বিষাদের ম্লান ছায়া। সে পরিবর্তন কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না, কিন্তু কেহই অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারিল না—সে পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত হেতুটা! সহসা সকলকে সচকিত করিয়া তাহার মুখ দিয়া একদা বাহির হইয়া আসিল এক অপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত প্রলাপ-উক্তি: আচ্ছা, বলিতে পারেন পার্বাক্ আমাকে বিবাহ করিতে চায় কেন? পুনঃ পুনঃ সেই একই

প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে থাকিল কখনও স্বগতভাবে কখনও বা সম্ভাষণ-যুক্ত হইয়া; কিন্তু সে জিজ্ঞাসার জবাব তাহাকে কে দিবে! দেখিতে দেখিতে চিত্তবৈকল্য আক্রমণাত্মক ক্ষিপ্ত বিকারে রূপান্তরিত হইল এবং দমদম হইতে সে স্থানান্তরিত হইল রাঁচির উন্মাদাগারে।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু চিত্তে আমার বিদ্ধ হইয়া গেল পার্লবাকের পরিণয় ইচ্ছার প্রশ্ন: জেলে পাগলা হইতে অনেককেই দেখিয়াছি এবং তাহাদের কণ্ঠে শুনিয়াছি বিভিন্ন ধরণের প্রলাপভাষণের ধুয়া, কিন্তু পাগলের কণ্ঠে, বিশেষ করিয়া পাগল রাজনৈতিক বন্দীর কণ্ঠে এমন অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে ইতপূর্বে আর কখনও শুনি নাই। তাই তাহার ব্যক্তিগত ও পরিবার-জীবন সম্বন্ধে তথ্য জানিবার কৌতূহল হইল এবং সেই কৌতূহলের বশে তাহারই প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার পারিবারিক জীবন ও জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে-গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিলাম সমগ্র ব্যাপারটি তাহার অপূর্ব আলোকপাতে নূতন আকারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ছেলেটির পিতা একজন মদ্যপায়ী ও লম্পট চরিত্রের লোক; প্রায় দিনই মাতাল অবস্থায় তিনি গৃহে ফিরিতেন এবং নির্মম প্রহারে ও পীড়নে পত্নীকে জর্জরিত করিয়া পৈশাচিক আস্ফালনে পাড়া তোলপাড় করিয়া তুলিতেন। যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁহারা ভাড়াটিয়া—নির্দোষ এক মহিলার উপর প্রতিদিন অনুষ্ঠিত এই অত্যাচার অবশেষে তাঁহাকে ব্যথিত বিচলিত করিয়া তুলিল, তিনি পীড়নের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা দিতে লাগিলেন এবং দূর হইতে বাচনিকভাবে বতদূর সম্ভব সে কার্যে বাধা দিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকের সহৃদয়তা ও সহানুভূতি মাতাল স্বামীর চক্ষে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইল এবং তাহার ফলে মাতালের মুখে যে কথাটি ফুটিয়া বাহির হইল তাহা ভদ্রলোকের

সম্মান ও পত্নীর মর্যাদা উভয়ের পক্ষেই গ্লানিকর ও কলঙ্কজনক। সে কুৎসা সংশ্লিষ্ট পক্ষের মনে সূচনাতে কিছুটা পরিমাণ ক্রোধ ও সঙ্কোচের উদ্রেক করিল বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহার দাহিকাশক্তি নিভিয়া আসিল, কঠিন পদার্থের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে করিতে তীক্ষ্ণতম অস্ত্রেরও ধার পড়িয়া যায়। আর একদিন উৎপীড়নের ক্ষেত্রে ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলে পানোন্মত্ত পতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া স্পষ্টই বলিয়া বসিল, এত যদি দয়া মহাশয়, দয়া করিয়া দায়-বন্ধন হইতে আমাকে অব্যাহতি দিয়া প্রেমের পাত্রীকে স্বগৃহে লইয়া গেলেই তো পারেন! ভদ্রলোক সে প্রস্তাবে সানন্দে সায় দিয়া মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, উনি যদি রাজি থাকেন, জীবন্ত যমালয় হইতে মুক্ত করিয়া এই মুহূর্তে আমি তাঁহাকে মনুষ্যত্বের ও নারীত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত আছি। সেই দণ্ডে না হইলেও কিছুদিন পরে দুঃসহতর অবস্থাগতিকে পড়িয়া ভদ্রমহিলাকে সে-প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল; মদ্যপ স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া তিনি নূতন আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন ও সন্তান পালনের জন্য নূতন জীবনের পথে পা বাড়াইলেন। পতিদেবতা এতদিন ধরিয়া যে-কুৎসা জড়িত জিহ্বায় গৃহ-পরিবেশের মধ্যে রটনা করিয়া আসিতেছিলেন, এবার তাহাকেও ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রের মধ্যে এবং সামাজের যে অংশটি আবর্জনা নিক্ষেপের পঙ্ককুণ্ডরূপে এই জাতীয় জঘন্য রটনা গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে তাহা সানন্দে সুরাপায়ীর উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত এই উদ্গারকে লুফিয়া লইল এবং ঘটনা সত্য হোক অথবা মিথ্যা হোক মাতালের রটনাকে সহস্রজিহ্ব হইয়া দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া দিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুত্র জননীর চরিত্র-সম্পর্কিত এই রটনা সম্বন্ধে যতই সচেতন হইতে লাগিল, ততই বন্ধু-মহলের

সহিত তাহার আচরণ আড়ষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল সহজাত সঙ্কোচ ও কুণ্ঠার দ্বারা। কারা-প্রবেশের প্রাক্কালে জেল কর্তৃপক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া তাহার দেহ তল্লাস করিলেন, কিন্তু অন্তর্নিহিত এই গোপন সঙ্কোচের কোন সন্ধান তাঁহারা পাইলেন না। জেলযাত্রী ঘনিষ্ঠ বন্ধু-মহলের কেহ কেহ এই ঘটনা জানিত এবং তাহাদেরই মধ্যে একজন নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্তে তরুণ বন্ধুটির সেই দুর্বলতম স্থান একদা স্পর্শ করিয়া বসে। সেই দিন, শুধু সেই দিন কেন, সেই দণ্ড হইতেই তাহার আচরণের রূপান্তর আরম্ভ হইয়া যায় এবং দেখিতে দেখিতে তাহা উদ্দাম উন্মত্ততায় পরিণতি লাভ করে। হয়তো ঠিক তাহারই পূর্বমুহূর্তে সে পার্লবাকের কোন গ্রন্থ পাঠ করিতেছিল, তাই স্বীয় জননীর আসনে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিতে তাহার আদৌ বিলম্ব হইল না; কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, জননীর আশ্রয়দাতা সেই ভদ্রলোকের ভূমিকা অভিনয় করিবে কে? যে জননীর চরিত্র সম্বন্ধীয় রটনার বোঝা তাহাকে আজও নতশিরে বহন করিতে হইতেছে ও আজীবন বহন করিতে হইবে, আহত সন্তানের উদ্ধত পৌরুষ চাহিল নির্মমভাবে সে মাতাকে দণ্ডিত করিতে। পার্লবাকরূপিনী যে জননীর নিকট সে আশা করিতেছিল নত শিরে সন্তানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মার্জনা ভিক্ষা, অসংযত চিত্ত-বৃত্তি ও বিকল বিচার-বুদ্ধির সুযোগ লইয়া সে পার্লবাক-রূপে আসিয়া নতশিরে নিবেদন করিয়া বসিল প্রেম। মার্জনা ভিক্ষা ও প্রেম-নিবেদন আকারে ভিন্ন বস্তু হইলেও প্রকারে তাহারা এক, উভয়েই সর্তহীন আত্ম-সমর্পণের স্বাক্ষর বহন করে; কাজেই তাহার দ্বারা উদ্ধত পৌরুষের দাবী চরিতার্থ হইল বটে, কিন্তু যে মূল্যে সে চরিতার্থতা তাহাকে অর্জন করিতে হইল সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ মনের সাধ্য কি তাহা দান করে! উদ্ধত পৌরুষকে তাই সে-মূল্য প্রদান করিতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল উন্মাদাগারে।

দমদম্ জেলে ব'সিয়া যখন পাগলের চরিত্র পাঠ করিয়া তাহা হইতে মনস্তাত্বিক মাল-মসলা সংগ্রহ করিতেছি এমন সময় বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল, আমার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার ছয় বৎসর বয়স্কা কন্যার কথায় ও আচরণে নাকি দিনে দিনে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে; সে দিনরাত্রি ট্রেনের বাঁশী ও স্টেশন হইতে ফিরিয়া-আসা ঘোড়াগাড়ীর শব্দ শুনিবার জন্য ব্যকুল হইয়া কান পাতিয়া থাকে ও মনে মনে কল্পনা করে, এই ট্রেনে বোধ হয় বাবা স্টেশনে নামিল, এই ঘোড়াগাড়ীটা বোধহয় বাবাকে বাড়ী লইয়া অসিতেছে! কল্পনার তাসের ঘর যতবার ভাঙ্গিয়া পড়ে, ততবারই সে সযত্নে আবার তাহা গড়িয়া তোলে স্বপ্ন-সৌধ, পুনরায় ধূলায় ধ্বসিয়া পড়িতে দেখিবার জন্য। ক্বচিৎ সে কাহারও সহিত কথা কয়, আহার্য-বস্তু সে আদৌ মুখে তুলিতে চায় না, কারণ তাহার ধারণা তাহার মধ্যে সার বস্তু বলিতে কিছু নাই, শুধুই পোকা কিলবিল করিতেছে। কন্যার অবস্থার বিবরণ পাঠ করিয়া ব্যথিত হইলাম ভাবিলাম, বহরমপুর জেলে থাকিতে মাসে অন্তত দুইবার সে আমাকে দেখিতে পাইত, কিন্তু দমদম্ জেলে চলিয়া আসা অবধি আমাকে সে একদিনও দেখিতে পায় নাই। তাহার মানসিক বিকারের হেতু হয়তো ইহাই; সুতরাং সাক্ষাতের জন্য একবার কন্যাসহ আমার স্ত্রী ও পিসিমাকে এখানে আসিতে বলি, আমাকে স্বচক্ষে একবার দেখিলেই সে তাহার মানসিক সুস্থতা পুনরায় ফিরিয়া পাইবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হইল, ঘটনা যদি ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিয়া বসে: বহুদিন পরে আমাকে কাছে পাইয়া কন্যা যদি জিদ্ ধরে বাবাকে সঙ্গে না লইয়া একা একা বাড়ী ফিরিবে না; তখন অবস্থাটা কি হইবে ভাবিতে ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল: সাক্ষাতের

জন্য নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে আমাকে জেলের ভিতর আবার ঢুকিতেই হইবে ; আমি থাকিব ফটকের ভিতরে, বাহিরে অফিস-প্রাঙ্গনে পড়িয়া কন্যা আমার করুণ আর্তনাদ করিবে, হয়তো মূর্চ্ছা যাইবে, আজও তাহার আচরণে যাহা যৎসামান্য অপ্রকৃতিস্থতা মাত্র—এই ঘটনার আঘাতে হয়তো তাহা আত্মপ্রকাশ করিবে পুরাদস্তুর পাগলামির আকারে।

সুতরাং দমদম্‌ জেলে দেখা-সাক্ষাতের সঙ্কল্প আমাকে পরিহার করিতে হইল এবং তৎপরিবর্তে সমগ্র বিষয়টি গভর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া আমি প্রার্থনা জানাইলাম, অসুস্থ কন্যার সহিত সাক্ষাত-লাভের সুযোগদানের জন্য সরকার যেন অবিলম্বে সাময়িকভাবে আমাকে বহরমপুর জেলে বদলী করেন। সদাশয় সরকার-বাহাদুরের প্রত্যাখ্যান আসিতে বিলম্ব হইল না এবং প্রত্যাখান-লাভের পর আমার মন অনুপায় হইয়া কন্যার মানসিক অসুস্থতার মনস্তাত্ত্বিক হেতু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল : ভাবিতে লাগিলাম, ইহা কি কেবলই আমার অদর্শনজনিত যাতনার ফল, অথবা ইহার পশ্চাতে অন্য কোন মনস্তাত্ত্বিক হেতু গোপনে কাযরত রহিয়াছে। আমার কন্যার স্বভাব আমি জানি, জানি সে স্বভাবত অত্যন্ত অভিমানী ও ভাবপ্রবণ, তাই মনে হইল, এমন কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নয়—যাহার আঘাতে তাহার ব্যথাহত মনের শিথিল চিন্তাসূত্রে জট পাকাইয়া গিয়া থাকিবে। আমার স্ত্রীকে সেই মর্মে পত্র লিখিলাম এবং বলিলাম, খুঁটিনাটীভাবে খোঁজ করিয়া দেখ—দুহিতার জীবনে অতি সম্প্রতি এমন কোন ঘটনা ঘটিয়াছে কিনা—যাহা তাহার মনে ব্যথা দিয়াছিল, চোখে জল আনিয়াছিল এবং সূচিত করিয়াছিল তাহার এই শোচনীয় মানসিক পরিবর্তনের সূত্রপাত। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসার পর যে বিচিত্র ঘটনার বিবরণ পাইলাম তাহা এই :

তখন পূজা প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে : আমার মেয়েটি জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত। একদিন বিকালের দিকে আমার স্ত্রী অসুস্থ কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সীবন-কার্যে রত, এমন সময় মেয়ে আমার তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মা, আমাদের পুরাণো জামা-কাপড় যাহা আছে ভাল করিয়া ধোয়াইয়া রাখিয়াছ তো? জননী সে প্রশ্নের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, পূজা আসিতেছে কিনা, আমাদের পরিতে হইবে তো—তাই বলিতেছি। আমার স্ত্রীর নিকট প্রশ্নট অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ মনে হওয়ায় তিনি হাসিয়া কন্যাকে বলিলেন, ষাট, পূজায় পুরাণ কাপড়-জামা তোমরা কেন পরিতে যাইবে! নূতন জামা-কাপড় তোমাদের জন্য কেনা হইবে তাহাই পরিও! কন্যা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিল, কিন্তু কে কিনিয়া দিবে, আমাদের তো বাবা নাই মা? এই কথা কয়টি কোনরূপে উচ্চারণ করিয়াই সে বালিসে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, জননী ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া তাহাকে সস্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন; কন্যার কথা ও ক্রন্দনের আঘাতে দীর্ঘ বিরহ-ব্যথিত নারী হৃদয়ের ধৈর্যের বাঁধ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গেল এবং যে বক্ষ আগাইয়া গিয়াছিল সান্ত্বনার স্নেহ-স্পর্শ দানের জন্য—তাহা নিজেই ফাটিয়া পড়িল যাতনার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে; সেদিন অপরাহ্ন-বেলায় আমি-হীন আমার আলয়ে জননী ও দুহিতার দুইটি তপ্ত অশ্রুধারার সম্মিলনে রচিত হইল যাতনার যুক্ত-বেণী। উচ্ছ্বসিত রোদনের আবেগ কমিয়া আসিলে আমার স্ত্রী কন্যাকে তাহার অদ্ভুত আচরণের ও তদপেক্ষা অদ্ভুত উক্তির হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন এবং জবাবে যাহা জানিতে পারিলেন তাহা এই যে, সেইদিনই কিছুক্ষণ আগে আমার নিকটতম প্রতিবেশীর কন্যা এবং আমার কন্যারই সমবয়স্ক বন্ধু সদ্য-কিনিয়া-আনা পূজার সাজে সজ্জিত হইয়া আমার মেয়েকে দেখিতে অথবা নিজের সাজ-সজ্জা দেখাইতে আসে এবং

নিতান্ত শিশু-সুলভ অচেতনতার বশেই বলিয়া বসে, তোরা এবার পূজায় কি পরিবি, তোদের বাবা তো নাই, কে তোদের নূতন জামা-কাপড় আনিয়া দিবে? নিতান্ত লঘুভাবে সে যাহা বলিল, আমার ভাব-প্রবণ কন্যার বুকে তাহা বাজিল গুরুতর আঘাতরূপে। অন্য কেহ হইলে সে আঘাতের বেদনা হয়তো চোখের জলে বিগলিত হইয়াই নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িত, কিন্তু মেয়ের আমার মানসিক গঠন স্বতন্ত্র উপাদানে, তাই আঘাতজনিত ব্যথাকে সে সঙ্গোপনে বুকে পুষিয়া রাখিল, বুকের শোণিত পান করাইয়া তাহাকে সযতনে লালিত-পালিত ও বর্ধিত করিয়া তুলিল। বর্ষচক্রের আবর্তনে আশ্বিন আবার সাড়ম্বরে ফিরিয়া আসিল শারদীয়া পূজার অর্ঘ-উপচার বহন করিয়া; জেলের বাহিরে পূজার বাদ্য শুনিতে শুনিতে রুদ্ধ কারাকক্ষের নিশীথ অন্ধকারে বসিয়া ভাবিতেছি, কন্যা আমার কি এখনও তাহার পিতার আগমন-পথ চাহিয়া ট্রেনের বাঁশী ও স্টেশন হইতে ফিরিয়া-আসা ঘোড়া-গাড়ীর শব্দের দিকে কান পাতিয়া আছে, এখনও কি প্রতীক্ষা করিয়া আছে—বাবার স্বহস্তে-কিনিয়া-আনা পূজার পরিচ্ছদের জন্য!

পঁচিশ

নবীন বনাম প্রবীণ

জেলে পাগলামীর হার হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, পাগলের শতকরা হার প্রবীণ ও পরিণত বয়স্ক বন্দীদের অপেক্ষা যুবক-বন্দীদের মধ্যেই অধিক এবং সে আধিক্য অতিমাত্রায়। অথচ পারিবারিক, সাংসারিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার দিক হইতে বিচার করিলে পাগল হইবার যথেষ্ট হেতু পরিণত বয়স্ক সংসারী ও ছাপোষা মনিষ্যিদের ক্ষেত্রে প্রবল আকারে বিদ্যমান; কিন্তু কার্যত দেখা যায়, উদোর পিণ্ডি গিয়া চাপে বুদোর ঘাড়ে এবং যে মন অন্যথা নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বিকার, কি জানি কোন্ দুর্বহ চিন্তার গোপন আঘাতে সে অকস্মাৎ একদা আত্ম-সম্বিত সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া বসে। একথা যে কেবল মনোজগতের পক্ষেই খাটে তাহা নয়, বস্তু-জগতের বেলায়ও এই একই নিয়ম কার্যকরী: ভূমিকম্প হইলেও নূতন তৈয়ারী আঁটো-সাঁটো ও পোক্ত বাড়ীর দেওয়ালেই চিড়খাইবার আশঙ্কা থাকে, অথচ জীর্ণ ও পুরাতন বাড়ীর ঢিল-ঢাল দেহ তাহার আঘাতে দোল খাইয়াও হ্যাকোচ-প্যাকোচ করিয়া দিব্যি দাঁড়াইয়া যায়। যুবক-দেহের মত যুবমনের কাঠামোও সম্ভবত কঠোর ও অনমনীয়, সে নিজের ক্ষেত্রে অনড় ও অচল অবস্থায় দাঁড়াইয়া বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনবোধে পিছু হটিয়া অথবা ডাইনে-বাঁয়ে নড়িয়া-চড়িয়া কোশলে তাহার আঘাত এড়াইতে জানে না, আঘাতের বেগকে ঠেকাইতে পারে, কিন্তু ঠকাইতে পারে না, সে আঘাত যখন দুর্ণিবার বেগে ছুটিয়া আসে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, ভীমসেনের মত গদা হস্তে সে গিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইবে,

পরাজিত ও ভূপাতিত হইবে তথাপি অমোঘ অস্ত্রের গতিপথ পরিহার করিয়া এতটুক এদিকে-ওদিকে সরিয়া দাঁড়াইবে না। প্রবীণরা জীবন-যুদ্ধের অভিজ্ঞ সৈনিকরূপে স্থিতি-স্থাপকতার যে ধর্ম আচরণ করিয়াছেন তাহারই বলে তাঁহারা দেহ ও মন প্রয়োজন অনুযায়ী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পারেন; সংগ্রাম যেমন ঘোষণা করিতে পারেন শান্তিও তেমনি স্থাপন করিতে পারেন: তাই কঠোর ক্ষাত্রনীতি অনুযায়ী যুদ্ধে তাঁহারা হয়তো হারিয়া যান, কিন্তু আপনাকে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলেন না; তাঁহাদের দেহ ও মনের ঢিল-ঢাল ও নড়বড়ে যে গঠন অন্যক্ষেত্রে অভিশাপ ও বিড়ম্বনাস্বরূপ, এক্ষেত্রে তাহা আশীর্বাদ ও বর্ম হইয়া দাঁড়ায়।

সাংসারিক ও পারিবারিক দুশ্চিন্তা ছাড়াও প্রবীণদের জেল-জীবনে আর একটি উপসর্গের উদয় হয় এবং তাহা আসে তারুণ্যের উপদ্রব হইতে! তরুণ বন্ধুগণ 'যা নিশা সর্বভূতানাং'-গীতোক্ত এই মহাবাক্য অনুসরণ করিয়া জেল-জীবন-যাপন করেন এবং তাহার ফলে দিন ও রাত্রি তাঁহাদের কারাজীবনে স্থান বিনিময় করে; সারারাত্রি সমবেতভাবে জাগিয়া সারাদিন সমষ্টিগতভাবে নিদ্রা যান, এই কারণে তাঁহাদের জীবনে নিদ্রার সময়ের পরিবর্তন হয় বটে, নিদ্রার মানের কোন পরিবর্তন হয় না এবং ঘুমের গড়পরতা হার প্রায় সমান থাকিয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের সারারাত্রিব্যাপী হৈ-হুল্লোড় ও বাগ-বিতণ্ডা খেলার উল্লাস ও খেয়ালের উপদ্রব, সমস্যার আলোচনা ও সঙ্গীতের চর্চা প্রবীণদের দেহে আনে পীড়া ও মনে আনে পীড়ন। প্রবীণদের পক্ষ হইতে সুবিচারের জন্য আবেদন-নিবেদন যে প্রচারিত না হয় তাহা নয় এবং যুবক বন্দীরাও যে তৎপ্রতি সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বধির থাকেন এমন কথাও বলিতে পারি না; তবে কার্যতঃ ঘটে এই যে, নৈশ-সভা যুবক-সমাবেশে সরগরম

হইয়া উঠিলে ব্যক্তিগত সদিচ্ছা ও সুবিবেচনা সমষ্টিগত উৎসাহের প্লাবনে ভাসিয়া যায় এবং যৌবন-জলতরঙ্গ একবার উদ্দাম হইয়া উঠিলে আর তাহা রুধিবে কে? হরে মুরারে হরে মুরারে!

মনে পড়িয়া গেল, বহরমপুর জেলের একটি মজার ঘটনা: আমরা তখন সাত নম্বর ব্যারাকের দোতলার বাসিন্দা এবং তাহারই নীচের তলায় পাশাপাশি যে দুইটি ঘর, তাহারই একটিতে থাকেন প্রবীণদের দল ও অপরটিতে যুবকবৃন্দ। হঠাৎ একদা গভীর রাত্রিতে জনৈক যুবকের মনে কি জানি কি কারণে বক্তৃতা দানের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল এবং টেবিলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কল্পিত জনসভার অশরীরী শ্রোতাগণকে সম্বোধন করিয়া আরম্ভ করিল: বন্ধুগণ! ভারতমাতা আজ বন্দিনী। ওই শুনুন তাঁহার পায়ের বন্ধন-শৃঙ্খলের ঝন্‌ঝনা শব্দ। ওই শুনুন তাঁহার কণ্ঠের রোদন-ধ্বনি। ইহা শুনিয়াও কি আপনারা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইবেন? উঠুন—জাগুন, মায়ের বন্ধন মোচনের দুর্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করুন! সে আরও কি বলিতে যাইতেছে এমন সময় পার্শ্বস্থ প্রবীণমহল হইতে বন্ধুবর বিজয় ঘোষালের সানুনয় কণ্ঠে সনির্বন্ধ অনুরোধ ধ্বনিয়া উঠিল: বাবা কালু! তোমার মূল্যবান বক্তৃতাটাও দয়া করিয়া আজিকার মত থামাও, কাল সকালে উঠিয়া আমরা তাহা শুনিব এবং শুনিয়া স্বাধীনতার সঙ্কল্প ও প্রেরণা যাহা গ্রহণ করিতে হয় করিব; এই গভীর রাত্রিতে নিদ্রিত জনতাকে অকারণ জাগাইয়া কি হইবে? ঘোষাল মহাশয়ের ঊর্ধ্ব-শ্লেষ্মা-জনিত মাথার যন্ত্রণা তো ছিলই, তদুপরি কালুর ভৈরব-ভাষণে সহসা নিদ্রাভঙ্গ ঘটায় সম্ভবত তাহার তীব্রতা তখন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা বাড়িলে কি হয়, শৃঙ্খলিতা ভারতমাতার আহ্বান আজ কালুর কণ্ঠে আশ্রিয়া ভর করিয়াছে: সে আবার আরম্ভ করিল—কিন্তু ভারত-

মাতা আজ শৃঙ্খলিতা, তাহা দেখিয়াও কি আমরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইব? সে শৃঙ্খল মোচনের জন্য জড়নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিব না?

ঘোষাল মহাশয়ের অনুনয় এইবার সুবিবেচনার নিকট আবেদন পেশের পথ পরিহার করিয়া ঐতিহাসিক যুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিল: তিনি বলিতে লাগিলেন, কিন্তু বাবা কালু, ভারতমাতা তো আজ সন্ধ্যায় শৃঙ্খলিত হন নাই, হইয়াছেন প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে; এই সার্ধ-শতাব্দী যদি সে যন্ত্রণা তাঁহার সহিয়া থাকে তাহা হইলে মাত্র এই একটা রাত্রির মত তাহা কি আর সহিবে না? এ রাতটা তুমি দয়া করিয়া নির্বিঘ্নে কাটিতে দাও, কাল সকালে উঠিয়া শৃঙ্খল মোচনের জন্য তুমি যাহা করিতে বলিবে, প্রতিজ্ঞা করিতেছি কোন প্রশ্ন না করিয়া তাহাই করিব। শুধু একটিমাত্র রাত্রির শান্তিভিক্ষা চাই।...কিন্তু বৃথা যুক্তি ও ব্যর্থ অনুনয়! কালু তাহার স্বাধীনতার সঙ্কল্পে অটল! জনতার সম্মুখে বৃদ্ধের অকর্মন্যতা বিশ্বাসঘাতকতার কথা অবারিত করিয়া ধরিবার জন্য সে উচ্চতর কণ্ঠে পুনরায় সুরু করিল: ভাইসব, বন্ধুসব! বৃদ্ধের বচন একবার শুনুন। ভারতমাতা শৃঙ্খলিত অবস্থায় পড়িয়া থাকেন থাকুন। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহাদের সুখনিদ্রার যেন এতটুকু ব্যাঘাত না ঘটে! প্রবীণদের এই প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে আপনারা কি এখনও বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন না?

ঘোষাল মহাশয় বুঝিলেন, রাত্রির ঘুমের দফা আজ একেবারে রফা হইয়া গেল, কারণ কালুর ভাষণের বেগে আজ আর ভাটা পড়িবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। কালুর আপোষ-বিরোধী সংগ্রামী-মনোভাবে হতাশ হইয়া ঘোষাল মহাশয় যখন অগত্যা অবস্থার সহিত আপোষ করিতে উদ্যত এমন সময় সহসা কোথা হইতে অনুকূল বায়ু

প্রবাহিত হইল, আক্রমণকারীর পক্ষ হইতে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আসিল এক শান্তি প্রস্তাব : কালু বলিল, বক্তৃতা আমি থামাইতে পারি, কিন্তু একটি সর্তে। কালুকে সর্তটা খুলিয়া বলিবার অবকাশমাত্র না দিয়া বন্ধুবর বিজয়বাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, বাবা কালু, তোমার সর্তের স্বরূপ না জানিয়াই আমি অগ্রিম প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিতেছি যে যেমন করিয়া হোক আমি তাহা পূরণ করিব ; এখন বল তোমার সর্তটা কি! সপরিমাণ তৎপরতার সহিত কালুর নিকট হইতে প্রস্তাব আসিল ; তবে ওয়ার্ডারের হাত দিয়া এক টিপ নস্যি পাঠাইয়া দিন! এত সহজে ও এত সস্তায়—এক মাত্রা নস্য মাত্র ঘুষ দিয়া সে রাত্রির গতপ্রায়-ঘুম পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যাইবে—ঘোষালমহাশয় তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই ; তিনি তৎক্ষণাৎ পাহারাওয়ালার মারফতে এক পুরিয়া নস্য পাঠাইয়া দিলেন এবং কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব উচ্চগ্রামে তুলিয়া জানাইয়া দিলেন, পুরিয়া কোন ছার, হাতে থাকিলে পিপাভরা নস্য পাঠাইতেও তাঁহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না। নস্য পাইবামাত্র কালু তাহার পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করিয়া দ্রব্যগুণের সম্মোহন প্রভাবে অচিরে শান্ত হইল এবং শৃঙ্খলিতা ভারতমাতাও বন্ধনের বিরুদ্ধে আর কোন প্রতিবাদ জ্ঞাপন না করিয়া সে রাত্রির মত শয্যাগ্রহণ করিলেন।

মনোবিজ্ঞানের মতে কোন ঘটনা তাহার আঘাতে হয় অনুরূপ কিম্বা বিপরীত কোন ঘটনার স্মৃতি জাগাইয়া তোলে : জেলের অভ্যন্তরে তরুণের বেপরোয়া অভিযান-কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া মনে পড়িয়া গেল, সহ-বন্দীদের জন্য এক প্রবীণ বন্ধুর নিবিড় একাত্মবোধ ও গভীর সহানুভূতির কথা। তখন আমরা বক্সাবন্দীশিবিরের বাসিন্দা ; বন্ধুবর সতীকান্ত মুখোপাধ্যায় ভোরে উঠিয়া জোলাপ লইবার জন্য ঘুম-ভাঙ্গানো ঘড়িতে এলার্ম দিয়া রাখিয়াছেন ; দারুণ শীতের রাত্রিতে বন্দীরা সকলেই

গভীর অনুরাগ সহকারে লেপের সহিত রাগ সাঁটিয়া গায়ে জড়াইয়াছেন এবং নাসিকার ছিদ্রপথটুকুমাত্র খোলা রাখিয়া গাঢ় ঘুমে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। ঘরে কে জাগ্রত আর কে নিদ্রিত তাহার হিসাব রাখিবার দায়িত্ব যন্ত্রের নয়, কাজেই বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে পরম নির্বিকার ও নিরপেক্ষভাবে যন্ত্রের সতর্ক-সঙ্কেত যথাসময়ে সরবে বাজিয়া উঠিল। এলার্ম-শব্দ শুনিবামাত্র সতীকান্তবাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি ত্রস্তে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন. কিন্তু বিপদ হইল—ঘড়ির চিৎকার যে থামিতে চায় না! শীতের শেষ-রাত্রির আরামদায়ক সুপ্তি হইতে কি শেষ পর্য্যন্ত সকলেই জাগিয়া উঠিবেন! অভিমন্যুর চক্রব্যূহে প্রবেশের মত সতীকান্তবাবুর এলার্ম দিবার বিদ্যাটা জানা ছিল, কিন্তু থামাইবার কৌশলটা তিনি শিক্ষা করেন নাই; কাজেই চিৎকার বন্ধ করিবার চেষ্টায় তিনি এখানে টিপেন সেখানে চাপ দেন, তথাপি এলার্ম কিন্তু বাজিয়াই চলিয়াছে, সে বাদ্যের বিরাম নাই, বিরতি নাই, কোন আদি যুগ হইতে আরম্ভ হইয়া কোন যুগান্তে গিয়া যে তাহা শেষ হইবে কে জানে! অথচ সতীকান্তবাবুর কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মুল্যবান: ঘড়ির বাচালতা যখন কিছুতেই বন্ধ হইল না!, এমন কি কণ্ঠশব্দ ক্ষীণতর হইবারও কোন লক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ পাইল না, অসহায় সতীকান্তবাবু তখন অনন্যোপায় হইয়া গায়ের মোটা র‍্যাগখানা দিয়া ঘড়িটিকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং নিবিড়ভাবে তাহাকে এমন করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন—যেন অসহায় পিতার পক্ষে তাঁহার দুরন্ত শিশুকে শান্ত করিবার ইহা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। এলার্ম অবশ্য তথাপি বন্ধ হইল না। তাঁহার শঙ্কিত হৃদস্পন্দনের ছন্দের সহিত তাল মিলাইয়া তখনো সে বাজিয়া চলিয়াছে। সে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী যদি কেহ না থাকিত, সতীকান্তবাবু স্বমুখে কোনদিনই তাঁহার এই যান্ত্রিক-অজ্ঞতার কথা লোকসমাজে খুলিয়া বলিতেন না। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে

ঘরের একজনমাত্র বন্দীর এলার্ম শব্দে ঘুম ভাঙিয়া যায় এবং নিদ্রিত জনতাপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের একমাত্র জাগ্রত দর্শকরূপে প্রাণস্পর্শী সে ব্যঙ্গ-নাট্যের অপূর্ব অভিনয় তিনি নিঃশব্দে ও নিঃসঙ্গ বসিয়া প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু নিদ্রিত বন্দীশালার নিশীথ অন্ধকারে প্রাণহীন যন্তরের সহিত সংবেদনশীল জীবন্ত অন্তরের সেদিন যে গোপন আলাপন হয়, উৎকর্ণ আগ্রহে তিনি কি তাহা শুনিয়াছিলেন, গভীর সহানুভূতিপূর্ণ মন দিয়া তাহার নিগূঢ় মর্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন ?

ছাব্বিশ

'খেপা খুঁজে ফিরে পরশ পাথর'

খেপা, সে প্রেমের জন্য হোক অথবা ধর্মের জন্যই হোক, জেলের ভিতরে হোক অথবা বহির্জগতেই হোক, আমার কাছে চিরদিনই সে এক বিরাট বিস্ময়; তাই আশৈশব তাহার সম্বন্ধে এমন অদম্য আগ্রহ আমি অন্তরে পোষণ করি যে, তাহাকে অহেতুক কৌতূহল না বলিয়া আত্মীয়-সুলভ আন্তরিক মমত্ববোধ বলিলেই যোগ্য আখ্যায় অভিহিত করা হইবে। দেহের দিক দিয়া দিব্যি নীরোগ ও নিখুঁত মানুষ, শরীরের কোন অঙ্গে কোনরূপ ব্যাধিজনিত বৈলক্ষণ্যের চিহ্নমাত্র কোথাও প্রত্যক্ষগোচর নয়; সহসা মনোরাজ্যের গোপন গহনে কোথায় কি ঘটিয়া গেল—অমনি মনো-যন্ত্রের ব্রেক হইয়া পড়িল একেবারে বিকল, ফলে মনের মেসিনের অসংযত গতিবেগ আর আয়ত্তে আসিল না; স্টীয়ারিং হুইল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার দরুণ অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে তাহাকে পরিচালন করা সম্ভব হইল না, হয়তো বা দিক্ নির্ণয়ের ক্ষমতা পর্যন্ত নিঃশেষে বিলুপ্ত হইল।

তবু তুলনামূলক বিচার করিয়া দেখিলে আমাদের মত তথাকথিত সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ মানুষের মনস্তত্ত্বের সহিত খেপা-খেয়ালের পার্থক্যই বা কতটুকু! বাড়ী যাইব বলিয়া বাজার হইতে রওয়ানা হইয়াছি। যথাসময়ে বাড়ী আসিয়া পৌছাইলামও, কিন্তু আসিতে আসিতে মন অন্যবিধ বহু চিন্তার সূত্র লইয়া জাল বুনিতে এমনই ব্যস্ত যে, পথের কথা ভাবিবার, পথরেখা লক্ষ্য করিবার অথবা সম্মুখে ও পার্শ্বে কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিবার অবকাশ পর্যন্ত সে পায় নাই; বাড়ী পৌছাইয়া ভাবিয়া বিস্মিত হই—কেমন করিয়া এখানে আসিলাম, আসিবার পথে কেনইবা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই নাই। মনের স্টীয়ারিং হুইলের উপর অলক্ষ্য কাহার হাতের অননুভবগম্য চাপ পা দুখানাকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিল, তাই উদ্দেশ্যহীনভাবে অন্য যে কোন স্থানে উপনীত না হইয়া উদ্দিষ্ট যথাস্থানে আসিয়া পৌছান আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে! পরমগম্ভীরভাবে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বই পড়িয়া চলিয়াছি, হঠাৎ কোন একস্থানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছনে চাহিয়া দেখি, অর্থহীন এক অসীম শূন্যতা পশ্চাতে ধূধূ করিতেছে, চোখের দৃষ্টি অক্ষর পাঠ করিয়াছে নির্ভুল-ভাবে, রসনার উচ্চারণেও কোথাও ভ্রান্তি ঘটে নাই, তবু চোখ যাহা পড়িল, জিহ্বা যাহা উচ্চারণ করিল—তথাকথিত সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ মন তাহার এক বর্ণও গ্রহণ করিল না কেন এবং তাহা যদি না করিল, তাহা হইলে তাহারই তাঁবেদার ইন্দ্রিয় দুইটির পক্ষে মনের নিয়ন্ত্রণ নিরপেক্ষভাবে স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? নিষ্ক্রিয় অবস্থায় একা যখন বসিয়া থাকি, মন মুহূর্তের জন্যও কোন বিষয়ে বিশেষ লগ্ন না রহিয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যেভাবে অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলে—তাহার সহিত খেপার খেয়ালের প্রকারগত কোনই পার্থক্য নাই এবং আকারগত পার্থক্য শুধু ইহাই যে, আমরা যাহা ভাবি তাহা তৎক্ষণাৎ কাজে করিয়া

কিম্বা কথায় বলিয়া বসি না, আর খেপার মনের অসংলগ্ন ও অসংযত খেয়াল মানস-সরোবরের জলে বুদ্বুদের মত ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে কাজে মূর্ত ও কথায় স্ফূর্ত হইয়া উঠে। পাগলামীর সহিত যে কেবল-মাত্র প্রতিভার সম্পর্কই ঘনিষ্ঠ তাহা নয়—তথাকথিত প্রকৃতিস্থতার পার্থক্যও অতিশয় সঙ্কীর্ণ এবং উভয়ের সীমারেখা অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরকে স্পর্শ করে, এমন কি ওতোপ্রোতভাবে অনেক স্থলে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়।

পাগলের প্রলাপের মধ্যে সুস্থ ও স্বাভাবিক মনের অসংযত সংলাপের আভাস শুনিতে পাই বলিয়াই পাগল সম্বন্ধে সম্ভবত আমার এই একাত্ববোধ এবং পাগলের প্রতি আমার এই আশৈশব আকর্ষণ দেখিয়াই বাবা হয়তো অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের জন্য ছেলে-বেলায় আমাকে খেপা বলিয়া ডাকিতেন। আমি তখন বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র ঃ একদিন ইস্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া দোতলার খোলা ছাদে পায়চারী করিতে করিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা-কাব্য ভাব-অভিব্যক্তি সহকারে পাঠ করিতেছি; কাব্যপাঠে এমনি তন্ময় যে, মাঠে খেলিতে যাইবার সময় হইয়াছে তাহা খেয়াল নাই, খেয়াল নাই যে বাবা যে-কোন মুহূর্তে কোর্ট হইতে বাসায় ফিরিতে পারেন। পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে মনে হইতেছে কে যেন কাহাকে সম্বোধন করিয়া কোথা হইতে কি বলিতেছে; সে কণ্ঠস্বর খুবই নিকটে, তবু মনে হয় তাহা যেন ভাসিয়া আসিতেছে অস্পষ্ট কোন এক নীহারিকা-লোক হইতে। ক্রমে ক্রমে শব্দের অন্তর্গত বাক্য ও বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ আমার চেতনার দ্বারে আসিয়া আবেদন জানাইল। বই হইতে চোখ তুলিয়া পিছনে চাহিতেই দেখি, বাবা অতি নিকট-পশ্চাতে আসিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন ও তাঁহার বিস্ময়-ব্যাদিত বদন দিয়া স্বগত ভাষণে বাহির হইয়া আসিতেছে এই কয়টি

শব্দ ঃ ছেলেটা সত্যি সত্যিই খেপিল নাকি ! ভয়ে ও বিস্ময়ের বিহ্বলতায় মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, পা দুখানা চলচ্ছক্তি হারাইয়া স্তম্ভের মত স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হইল ; কম্পিত হাত হইতে বইখানা খসিয়া পড়া উচিত ছিল, কিন্তু কাব্যাসক্তির আঠায় সাঁটিয়া থাকার দরুণ মাধ্যাকর্ষণশক্তির হাত হইতে সে হয়তো অব্যাহতি পাইয়া থাকিবে। কাব্যপাঠ করিতে দেখিয়া আমার প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে বাবার মনে একটা সন্দেহ জাগিয়াছিল মাত্র ; কিন্তু দুর্দৈবক্রমে যেদিন তিনি আবিষ্কার করিয়া বসিলেন যে, আমি শুধু কাব্য পাঠই করিনা, কবিতা রচনাও করিয়া থাকি—আমার অবস্থা-বিপাক সম্বন্ধে সেদিন তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

কিন্তু বাবা তাঁহার অতি সূক্ষ্ম ও সুস্থ বিচার-বুদ্ধি দিয়া ধারণাও করিতে পারেন নাই যে, অনতিদূর ভবিষ্যত তাঁহাকে বিচিত্র এক খেপামীর নিকট পরাজয় বরণ করিয়া খেপার সন্ধানের জন্য আমারই শরণাপন্ন হইতে হইবে! ১৯১৪ সালের এপ্রিল অথবা মে মাস হইবেঃ ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর অখণ্ড অবকাশ ভোগ করিতেছি। এমন সময় সহপাঠি ও বাল্যবন্ধু পশুপতি আসিয়া সংবাদ দিল যে, তারাখেপা তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন, দরকার মনে করিলে আমি গিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারি। পশুপতি গাঙ্গুলির বাবা চন্দ্রবাবু তখন ছিলেন মেইন হোষ্টেল সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট এবং তাহাদের বাসা ছিল হোষ্টেলেরই একাংশে। বন্ধুবর পশুপতির কাছে তারা খেপার বহু অলৌকিক কীর্তি-কাহিনীর কথা শুনিয়া তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, এবার তিনি আসিলে আমি যেন খবর পাই। প্রার্থিত সে সংবাদ পাইয়াও আমি কি নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারি! সেইদিনই আহারান্তে দুপুর বেলায় তথায় গিয়া হাজির হইলামঃ তারা-খেপা যে-ঘরে বসিয়াছিলেন পশু আমাকে সেই ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। একটি বালিকা ও মেইন হোষ্টেলেরই

জনৈক বি, এ, ক্লাসের ছাত্র তখন সে ঘরে বসিয়াছিলেন, দূর হইতে প্রণাম করিয়া আমি তাঁহাদেরই মাঝখানে আসন গ্রহণ করিলাম ; পশুর কাছে পূর্বেই শুনিয়াছিলাম যে তারা-খেপা অত্যন্ত বদরাগী, কাজেই নিরাপদ ব্যবধান রক্ষা করিয়াই তাঁহার নিকটস্থ হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য। সন্ন্যাসীর ঝাঁকড়া চুল উন্নত দুই স্কন্ধে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে ! দেহ বলিষ্ঠ ও সুগঠিত, চোখ দুইটি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, অস্বাভাবিক দীপ্তিপূর্ণ তাহার দৃষ্টি। তাহা ছাড়া, শুনিয়াছিলাম তিনি শুধু সন্ন্যাসীই নহেন, গুপ্ত কোন এক বিপ্লবীদলের বিশিষ্ট সভ্য হিসাবে স্থানীয় গোয়েন্দা-বিভাগে সন্দেহের পাত্র ও সন্ধানের সামগ্রী। কিছুক্ষণ পরে বালিকাটি ও ভদ্রলোকটি উঠিয়া গেলেন ; যত দুর মনে পড়ে মেয়েটি ছিল স্থানীয় তৎকালীন পোষ্ট-মাষ্টারের কন্যা, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া সে তারাখেপার নিকট রোজই আসিত আশীর্বাদ ও তৎসহ আরোগ্যলাভের আশায়। এতক্ষণে কক্ষে একাকী আসীন খেপা ও তাহারই নিকট-সান্নিধ্যে উপবিষ্ট একা আমি : আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে খেপা সম্পূর্ণরূপে অচেতন, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন কোন দূর ভবিষ্যতের অনাগত দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছে। হঠাৎ ঘরের মেঝে হইতে খাতার একখানা ছেঁড়া পাতা কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে গোলাকার করিলেন এবং সজোরে তাহার উপর এক কিল কষিয়া থেঁৎলানো কাগজের টুকরাটা আমার নাসিকাগ্রে তুলিয়া ধরিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, বল্, কি হইল ? পশুপতির সতর্কবাণী স্মরণ করিয়া আমি সভয়ে সঙ্কুচিত হইলাম এবং আশঙ্কায় আড়ষ্ট কণ্ঠে বলিলাম, বসিয়া গেল। খেপা তৎপরতার সহিত বলিলেন, শুধু বসিয়াই যায় নাই : যে জায়গাটা উঠিয়াছিল তাহা বসিয়া গেল এবং যেখানটা বসিয়াছিল তাহা উঠিয়া পড়িল। তাহার পর পুনরায় নীরব ; বহুক্ষণ পরে মৌনতা ভঙ্গ করিয়া তিনি বলিলেন, লণ্ঠন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

আমার বিস্মিত ও বিহ্বলভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, লণ্ঠন বোধ হয় তুই বুঝিতে পারিলি না, তোরা যাহাকে লণ্ডন বলিস, আমার অভিধানে তাহারই নাম লণ্ঠন ; ইউরোপে ভীষণ যুদ্ধ আসন্ন, বেটা রক্তবীজের বংশ নিজেরা কাটা-কাটি করিয়া মরিবে এবং তাহার ফলে কত উন্নত দেশ অধঃপাতিত হইবে এবং অনুন্নত দেশের হইবে উত্থান।

আপন অজ্ঞাতসারেই আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল এই কৌতূহলী প্রশ্ন—কিন্তু তাহাতে আমাদের লাভ ? এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, তৎকালীন অনুশীলন সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও নির্বাসন হইতে সদ্য বহরমপুরে প্রত্যাগত ভূপেশ নাগ মহাশয়ের নিকট স্বদেশীর প্রথম মন্ত্র-দীক্ষা আমার তৎপূর্বেই হইয়া গিয়াছে, কাজেই দেশের লাভ লোকসানের পরি-প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ঘটনার পরখ করা আমার পক্ষে তখন আর অনধিকার চর্চা নয় এবং সত্য কথা বলিতে কি তারাখেপাকে যে আমি দেখিতে আসিয়াছি—তাহা তাঁহাকে সন্ন্যাসী ভাবিয়া ততটা নয়—যতটা বৈপ্লবিক সমিতির সদস্য জানিয়া। সন্ন্যাসের সহিত স্বাদেশিকতা মিশিয়া, তন্ত্র-সাধনার সহিত স্বাধীনতা-মন্ত্র মিলিত হইয়া তাহাকে আমার তরুণ-মনের নিকট অধিকতর মহীয়ান ও গরীয়ান করিয়া তুলিয়াছিল। খেপারও সম্ভবত সে তত্ত্ব অজ্ঞাত ছিল না, তাই আমার সহিত আলাপে তিনি প্রসঙ্গক্রমেও ধর্মের ধার ঘেঁষিয়া যান নাই। যাহা কিছু আলাপ ও আলোচনা তৎসমুদায়ই স্বদেশ ও সমাজ-সেবাকে কেন্দ্র করিয়া। কৌতূহলী আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিলেন, লাভ আপাতত প্রত্যক্ষভাবে কিছুই নয়, তবে পরোক্ষ লাভ এই যে, শোণিতক্ষয়ে শত্রুপক্ষ দুর্বল হইবে। স্বাধীনতা কোথায় ও কতদূরে এখান হইতে তাহা আমার দৃষ্টিগোচর নয়।

সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সন্ন্যাসী নীরবে বসিয়া আছেন আর আমি

শ্রদ্ধা ও বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে তাঁহার দিকে চাহিয়া অদূরে উপবিষ্ট ; এমন সময় সহসা দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া তিনি বলিলেন, সন্মুখে চাহিয়া দেখ · কি দেখিতেছিস ? দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি, স্কোয়ার ফিল্‌ডে কয়েকটি গরু চরিতেছে আর স্কোয়ারেরই উত্তর দিকের রাস্তা দিয়া ক্বচিৎ দুই-একজন লোক যাতায়াত করিতেছে ; কিন্তু তাহারা সঞ্চরণশীল, কাজেই লোকের কথা না বলিয়া বলিলাম, গরু। রোষ ও ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিলেন, গরুর মতই বুদ্ধি কিনা তাই গরু ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না ; আমি কিন্তু দেখিতেছি—বিপুল বন্যা নদীর দুই কূল ছাপাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে বর্ধমানকে লক্ষ্য করিয়া আর তাহারই প্লাবনে মানুষ সমেত তাহার ঘর-বাড়ী ও যথাসর্বস্ব ভাসিয়া চলিয়াছে তরঙ্গের মুখে শুষ্ক তৃণ-খণ্ডের মত! তখন দরকার হইবে তোদের মত তরুণদলের সেবা ও সাহায্যের, যাইবি, যাইতে পারিবি বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে সেবাব্রতীরূপে ? কক্ষ ছাপাইয়া আবার নামিয়া আসিল শব্দহীন নিস্তব্ধতা। গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নের রৌদ্রদাহে সহরের রাস্তা ও ঘাট-মাঠ খাঁ খাঁ করিতেছে, বাড়ীর লোকজনও হয়তো ঢলিয়া পড়িয়াছেন দিবানিদ্রাকোলে ; এরূপ অবস্থায় কক্ষের নীরবতা ক্রমে আমার পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল এবং মনে হইতে লাগিল অন্তহীন সে মৌনতা বুঝি বা আর কোনদিন ভঙ্গ হইবে না। ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীর অচেতন উপস্থিতির সম্মুখে নীরবে প্রণাম জানাইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

বাড়ীতে একদিন কথাপ্রসঙ্গে পিসিমার কাছে খেপার কথা খুলিয়া বলি এবং তিনি তাহা পৌছাইয়া দেন বাবার নিকটে। সব কথা শুনিয়া বাবা অবিশ্বাসের এবং সম্ভবত অনুকম্পার হাসি হাসিলেন এবং বিদ্রূপপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করিয়া বিরূপ মন্তব্যসহকারে বলিলেন, খেপায় খেপা চেনে কিনা তাই যত রাজ্যের খেপার খবর আসে তোমাদের খেপার

আফিসে। খাইতে বসিয়া বাবার ব্যঙ্গ খাদ্যবস্তুর সহিত নীরবে গলাধঃকরণ করিলাম, কিন্তু সহজে পরিপাক করিতে পারিলাম না : নিষ্ফল আক্রোশে মন বুকের দরজায় মাথা ঠুকিতে লাগিল এবং বাবার প্রতি করুণা হইতে লাগিল খেপার ভবিষ্যদ্বাণী যেদিন সফল হইবে সেদিনের কথা চিন্তা করিয়া।

তিন-চার মাস পরের কথা : দোতলার ঘরে বসিয়া পড়া-শোনা করিতেছি—এমন সময় ঝি আসিয়া জানাইল যে, বাবা নীচের বৈঠকখানা-ঘরে আমাকে ডাকিতেছেন। নামিয়া গিয়া দেখি, সম্মুখের খোলা সংবাদপত্রের উপরে বাবার কৌতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ; আমার উপস্থিতির আভাস পাইয়া তিনি খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিলেন এবং চোখে বিদ্রূপের নয়, বিস্ময়ের দৃষ্টি লইয়া বলিলেন, তাইতো রে, তোর খেপার কথা দেখিতেছি ফলিয়া যায় বুঝি, ইউরোপে যুদ্ধ যে সত্য সত্যই বাধিয়া উঠিল দেখিতেছি। বাবার কথা শুনিতে শুনিতে মনে হইতে লাগিল আমার পা যেন মাটি ছাড়িয়া বেশ কিছুটা উঁচুতে উঠিয়াছে এবং আমার মাথা উচ্চতায় বাবাকে পরাজিত করিয়া যেন উর্ধ্বতর-লোকে উত্থিত হইয়াছে। বাবার কিন্তু তখনও ধারণা, খেপার কথার সহিত ঘটনার এই সামঞ্জস্য নিতান্ত দৈবদুর্ঘটনা মাত্র; তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিতেও বড় বেশী বিলম্ব হইল না এবং সংবাদপত্রে যেদিন বর্ধমানের বন্যার খবর সত্য সত্যই বাহির হইল, বাবা সেদিন কেবলমাত্র সে খবরটা জানাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, বলিলেন, তোর সে খেপা এখন কোথায়? তাহার সহিত আমার একবার দেখা করাইয়া দিতে পারিস! শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে বুক আমার তখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে—তাই মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিলাম না; মন কিন্তু মনে মনে এই কথাই কহিয়া চলিয়াছে : কিন্তু হায় পিতা! তাহা কি করিয়া সম্ভব!

খেপার দৈনন্দিন জীবনের কার্যসূচি তো খবরের কাগজে ছাপা হয় না, তাহার আসা-যাওয়ার স্থান ও কালের নির্ঘণ্ট, তাহার ভ্রাম্যমান জীবনের দিনপঞ্জী তো সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় না! আনা-গোনার পথে কচিৎ কোনদিন কাহারও দেহে ও মনে যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে একদা তাহার চলমান জীবনের ছায়া পতিত হয়, তেমনি আকস্মিকভাবেই একদিন পরশমণির সন্ধানে কোন সুদূরে সে সরিয়া যায়—শত চেষ্টাতেও তাহার আর খোঁজ খবর মেলে না: পরশমণি মর্ত-মানবের চির-চাওয়া অথচ চির-না-পাওয়া এক অমূল্য সম্পদ এবং তাহার সন্ধানে পাগলের পৃথিবী পরিক্রমা অন্তহীন এক অবিরাম তীর্থযাত্রা!

সাভাশ

চিন্তার রোমন্থন

চলার পথের পাঁচালী-গানের পালা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। চলিতে চলিতে যেমন একদা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফিরিয়া চাহিয়াছিলাম—পিছনে ফেলিয়া-আসা দূর-প্রসারী পথরেখার দিকে, বলিতে বলিতেও আজ তেমনি পিছন ফিরিয়া দেখি, না-বলা কত কথাই না পথের দুইধারে বিক্ষিপ্ত রহিয়া গেল! তাহাদিগকে কুড়াইয়া গুছাইয়া আনিবার না হইল অবসর, না পাইলাম প্রসঙ্গ। জীবনের ঘটনাগুলি যেন স্রোতের শৈবাল। প্রসঙ্গের প্রবাহে যাহারা দৈবাৎ আসিয়া পড়িল জোয়ার এবং ভাটার টানে, তাহারা কখনও ভাসিয়া

আসে নিকটে, আবার কথনও বা বহিয়া যায় সুদূরে ; আর প্রসঙ্গের প্রবাহ যাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিল না, তাহারা ভীড় জমাইল জীবন-নদীর কূলে কূলে ও ঘাটে ঘাটে। তাই দূরে দাঁড়াইয়া আজ তাহাদিগকে একান্ত অসহায়ভাবে চাহিয়া দেখিতেছি, কিন্তু যে শৈবালদল কূল আঁকড়াইয়া জীবন-নদীর দুই পার্শ্বে পড়িয়া রহিল, তাহাদিগকে প্রসঙ্গের প্রবাহে টানিয়া আনিবার সূত্র পাইলাম না।

অথবা এমনও তো হইতে পারে যে, আমার অবচেতন মন হয়তো নিগূঢ় কোন বেদনা ও বিরাগ বশে তাহাদিগকে ভুলিয়া থাকিতেই চাহিয়াছে, স্মরণের সূত্রে তাহাদিগকে গ্রথিত না করিবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছে! মনঃসমীক্ষণ-শাস্ত্রের মতে নিতান্ত পরিচিত কোন বস্তু অথবা ব্যক্তিকে যখন আমরা শত চেষ্টাতেও স্মরণ করিয়া উঠিতে পারি না, তখন ধরিয়া লইতে হইবে—যে কোন কারণেই হোক, তাহাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট মন বিরক্তিকর ও বেদনাদায়ক সে স্মৃতি স্মরণ করিতে প্রস্তুত নয়; বস্তুত যাহা স্মরণ করিবার অনিচ্ছা—মনের আচরণে তাহা স্মরণ করিবার অক্ষমতারূপে প্রতিভাত হয়।

এই ধরণের বিস্মৃতির একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত আহরণ করিবার জন্য পুনরায় আমাকে কৈশোর-জীবনের প্রভাত-অঙ্গনে ফিরিয়া যাইতে হইল: আমার বয়স তখন প্রায় পনর। মাতুলালয় হইতে সংবাদ আসিল মাতামহ মৃত্যুশয্যায়। তাঁহাকে শেষ-দেখা দেখিবার জন্য বাবা আমাকে গড়বেতা পাঠাইতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু মুস্কিল হইল এই যে, যাঁহার সহিত আমি গড়বেতা যাইব সেই পিসেমশাই লোকটি ছিলেন নিতান্ত সাধা-সিধে ও ভালমানুষ-গোছের জীব, কাজেই তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা হইয়া আমাকে মাতুলালয় পাঠাইতে বাবা ভরসা পাইলেন না। স্থির হইল, আজিমগঞ্জ হইতে আসানসোল ও আদ্রা

হইয়া আমরা গড়বেতা যাইব। পথটা অবশ্য অত্যন্ত ঘোরা, কিন্তু সুপথ দূর ভাল—এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া মস্তক পরিক্রমা করিয়া নাসিকা প্রদর্শন করিতে আমরা প্রস্তুত হইলাম। আসানসোল পৌছাইয়া আমরা যে কামরায় চাপিলাম তাহাতে দুই তিনজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন; পিসেমশাই গিয়া তাঁহাদের নিকট প্রথমেই পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন, আমরাও কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। এই পরিচয় জ্ঞাত হইবার পর আমাদের সম্বন্ধে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদ্বয়ের মনে স্বজাতিসুলভ প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হইল এবং তিন দেশোয়ালী দোস্তের মধ্যে অচিরে আলাপ জমিয়া উঠিল দস্তুরমত। তখন গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহর বেলা। পিসেমহাশয়কে জানাইলাম, আমার অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছে। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়া দুই হাতে আমাদের দুজনের জন্য বরফ-মিশ্রিত দুই গেলাস আইসক্রিম জাতীয় লাল পানীয় লইয়া আসিলেন। কামরার মধ্যে তিনি যেই না পুনঃপ্রবেশ করা—অমনি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদ্বয় উত্তরীয় দিয়া নাক চাপিয়া ধরিয়া রাম রাম করিতে করিতে কামরা হইতে নামিয়া পড়িলেন। ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া পিসেমশাই তাঁহাদের স্থান ত্যাগের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে দ্বিজযুগল উত্তেজিত কণ্ঠে ও নাসারন্ধ্র বন্ধ থাকার দরুণ অনুনাসিক স্বরে স্বাধীন ভারতের ভাবী রাষ্ট্রভাষায় যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ: এই একটু আগে আপনি না পরিচয় দিলেন, আপনারা পবিত্র কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। অথচ দিব্য আরামে নিজে সুরা পান করিতেছেন ও আর একটি সুরাপাত্র সন্তানের হাতে সস্নেহে তুলিয়া দিয়াছেন, এরূপ দুর্জনের সংসর্গ ত্যাগের জন্যই আমাদিগকে স্থান ত্যাগ করিতে হইতেছে। পিসেমশাই এক-আধটু আফিং খাইতেন বটে, কিন্তু সুরাপান তাঁহার স্বপ্নের অতীত; তিনি ব্যস্ত

হইয়া যতই ব্যাপারটা বুঝাইবার জন্য তাঁহাদের নিকটস্থ হইতে লাগিলেন, তাঁহারা ততই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন, চাদরের সাহায্যে নাসারন্ধ্র আরও ঘনতরভাবে আচ্ছাদিত করিয়া, পাছে সুরার উৎকট দুর্গন্ধ তাঁহাদের নাসিকায় প্রবেশ করে, মদ্যপায়ীর অশুচি স্পর্শে পাছে তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য মর্য্যাদা কলঙ্কিত হয়। আমাদের আইস্‌ক্রিমের রং ছিল ঘোর লাল, কাজেই প্রত্যক্ষত যাহা রঙীন-পানি তাহাকে সাদা জল হিসাবে চালাইয়া দেওয়া পিসেমশায়ের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইল না, বৃদ্ধবয়সে মদ্যপানের অপবাদ মাথা পাতিয়া লইয়া তর্কযুদ্ধে তাঁহাকে পরাজয় মানিতে হইল।

গড়বেতা স্টেশনে নামিয়াই শুনিলাম, মাতামহ সেইদিন সকালেই গত হইয়াছেন। মাতামহের স্মৃতি আমার মনে তখন আর তেমন সজাগ ছিল না, তথাপি তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে মর্মাহত হইলাম—সম্ভবত এই কথা মনে করিয়া যে, তাঁহাকে দেখিবার ও দেখা দিবার যে আশা বুকে লইয়া এই দীর্ঘদিন পরে গড়বেতায় ছুটিয়া আসিতেছি তাহা চিরতরে বিলুপ্ত হইল। একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা যখন স্টেশন হইতে গড়বেতা রওয়ানা হইলাম তখন প্রায় মধ্য রাত্রি। কতক্ষণ পরে জানিনা—পিসেমশাইয়ের ডাকে জাগিয়া উঠিয়া দেখি, গাড়ী একটি বাড়ীর দরজায় আসিয়া ভিড়িয়াছে। বাড়ীটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পিসেমশাই বলিলেন, আমি তো গড়বেতায় ইহার আগে কখনও আসি নাই, কাজেই তোমার মাতুলালয়ের চেহারা আমি চিনিনা। তুমি চাহিয়া দেখ,ইহাই তোমার মামারবাড়ী কিনা! দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া বাড়ীখানার দিকে অর্থহীন উদাস দৃষ্টি মেলিয়া আমি অপলকচক্ষে চাহিয়া আছি, কিন্তু আমার স্মরণের পটে তখন মাতুলালয়ের কোন ছবিই ফুটিয়া উঠিতেছে

না—চোখের সামনের এই বাড়ীটাকে যাহার সহিত আমি মিলাইয়া লইতে পারি। পিসেমহাশয়ের আহ্বানে ভিতর হইতে জবাব আসিলে, পিসেমশাই অদৃশ্য উত্তরদাতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিলেন, এটা শুকুলদের বাড়ী? সম্মতিসূচক জবাব দানের পর অদৃশ্য কণ্ঠ হইতে প্রশ্ন আসিল, আপনি কাহার বাড়ী চান? উত্তরে পিসেমশাই আমার মাতামহের নাম করিলে অলক্ষ্য কণ্ঠ মন্তব্য করিল, আপনি ভুল করিয়াছেন এবং গাড়োয়ানকে নির্দেশ দিল, গাড়ী বাবুদের বাড়ী লইয়া যাইতে।

আমার মামার বাড়ীকে শুকুল-বাড়ীরূপে অভিহিত করিয়া পিসেমশাই বাস্তবিকই একটা মস্ত ভুল করিয়াছিলেন: আমার মামাদের বংশগত উপাধি যদিও শুকুল তথাপি তাঁহাদের বাড়ী 'শুকুল-বাড়ী' হিসাবে পরিচিত নয়, জমিদারবাড়ীরূপে জনসাধারণ তাহাকে 'বাবুদের বাড়ী' বলিয়াই জানে। গাড়ী অনতিবিলম্বে সেখান হইতে আসিয়া মাতুলালয়ের দেউড়িতে দাঁড়াইল; পিসেমশাই পূর্বের মত এবারেও আমাকে বাড়ী চিনিয়া লইতে বলিলে গাড়ী হইতে আমি নীচে নামিয়া আসিলাম এবং দেউড়ির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম বিহ্বলের মত। ভোর যদিও তখনও হয় নাই, তথাপি শেষ রাত্রির অন্ধকার তরল ও স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; সেই আবছা তরল অন্ধকারে বাড়ীটার দিকে নির্ণিমেষ নেত্রে যতই চাহিতে লাগিলাম, মনে হইতে লাগিল—তাহা যেন অচেনা ও অদৃষ্টপূর্ব। যে বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আট বৎসর বয়স অবধি যাহার অঙ্কে লালিত-পালিত হইয়াছি—কী আশ্চর্য! তাহার সমগ্র স্মৃতি আজ স্মরণের পট হইতে এমন নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহারই রুদ্ধ দ্বারপ্রান্তে আমি আজ আগন্তুক ও নবাগত অতিথির মত দণ্ডায়মান; শত চেষ্টাতেও অন্ধকার চিত্তের ফলকে সে স্মৃতির ক্ষীণতম রেখাও ফুটিয়া উঠিতেছে না। বিস্মিত ও বিহ্বল দৃষ্টিতে দেউড়ির দিকে চাহিয়া

থাকিতে থাকিতে সহসা চোখ পড়িয়া গেল দেউড়ির দুই পার্শ্বস্থ চেরা-থাম দুইটার উপর, সঙ্গে সঙ্গে শান্ত স্মরণ-সায়রের বুকে জাগিয়া উঠিল ঈষৎ চাঞ্চল্য, দেখিতে দেখিতে চঞ্চল সে-সায়রের জলে অস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিল সুদূর শৈশব-দিনের একটি দুর্ঘটনার প্রতিচ্ছবি : আমার বয়স তখন প্রায় পাঁচ বৎসর ; একদিন বিকালের দিকে আমরা জনকয়েক ছেলে মিলিয়া চেরাথামের মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া পরস্পরের সহিত উচ্চকণ্ঠে আলাপ করিতেছি ; সে স্বর গম্ভীর প্রতিধ্বনি তুলিয়া থামের মধ্যে গুমরিয়া ফিরিতেছে। ইহাই ছিল আমাদের প্রতিদিনের অভ্যস্ত আমোদ ; সেই অভ্যাসবশেই সেদিনও আমোদ উপভোগ করিতে গিয়া দুর্দৈববশে এক নিদারুণ প্রমাদ ঘটিয়া গেল : কি জানি কেমন করিয়া আমার মাথা বিভক্ত-থামের মধ্যে এমন নিবিড়ভাবে আবদ্ধ হইয়া গেল যে, কোনক্রমেই তাহা আমি টানিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। স্তম্ভের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ নাসিকা আমার তখন বাঁচিয়া থাকিবার মত শ্বাসবায়ু পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেছে না; প্রতি মুহূর্তে দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে আর আমি হাড়কাঠে আবদ্ধ অসহায় ছাগ-শিশুর মত আর্তনাদ করিতেছি। সে ক্রন্দনে পথচারী ও সিপাই-সান্ত্রীর দল অকুস্থলে আসিয়া জুটিল, গৃহস্বামীর কর্ণেও সে সংবাদ পৌছাইতে বিলম্ব হইল না ; স্থির হইল মিস্ত্রী ডাকিয়া আনিয়া থাম ভাঙ্গিয়া মাথা বাহির করিতে হইবে। মিস্ত্রী ডাকিবার জন্য সেই মুহূর্তে লোক ছুটিল, কিন্তু মিস্ত্রী আসিয়া পৌছিবার পূর্বেই যেমন দৈবাৎ মাথা আটকাইয়া গিয়াছিল—ঠিক তেমনি দৈবক্রমেই মাথা আলগা হইয়া থামের গ্রাস হইতে পিছলাইয়া বাহির হইয়া আসিল।' দ্বিখণ্ডিত স্তম্ভের দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র মনে পড়িয়া গেল —সে দুর্ঘটনার বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস এবং তাহা পড়িবার মুহূর্ত মধ্যে সে বিরাট অট্টালিকার পরিপূর্ণ ছবি মনের পটে ফুটিয়া উঠিল এমন সুস্পষ্ট

রেখায় ও পরিস্ফুট আকারে যে, মনে হইল কেহ যদি আমার চোখে কাপড় বাঁধিয়া দেউড়ির দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করাইয়া দেয়, আমি স্বচ্ছন্দে সমগ্র অট্টালিকার প্রতিটি কক্ষ ও অঙ্গন পরিক্রমা করিয়া পুনরায় যথাস্থানে ফিরিয়া আসিতে পারি। তখন আমি আর দুজ্ঞেয় রহস্য-নিকেতনের দ্বারপ্রান্তে সমাগত আগন্তুক নই, সুদীর্ঘ প্রবাস-জীবনের শেষে আপন আলয়ে-ফেরা যাত্রী যেন গৃহদ্বার অর্গল-মুক্ত হইবার শুভমুহূর্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে! যে বেদনা, বঞ্চনা ও বিভীষিকার আঘাত বুকে বহিয়া শৈশব ও কৈশোর-জীবনের সন্ধিক্ষণে মাতুলালয় হইতে বিদায় লইয়াছি সম্ভবত তাহাই আমার স্মরণের সিংহদ্বারে সতর্ক প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান রহিয়া তথাকার প্রতিটি স্মৃতির প্রবেশ-পথ সযত্নে রোধ করিয়াছে; এই কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কল্যাণে মনের মণিকোঠায় তাহাদের প্রবেশ ও প্রস্থান, উত্থান ও পতনের পদধ্বনি কোনদিনও শ্রুত হয় নাই, ফলে চিত্তের সে ক্ষেত্রটি শ্মশানের নিঃসীম শূন্যতায় অহরহ খাঁ খাঁ করিয়াছে। মন যেখানে চিন্তায় অতীত স্মৃতির রোমন্থন করে, শুষ্ক ও শীর্ণপ্রায় স্মৃতি হইতে সঞ্জীবন রস ক্ষরিত হইয়া একদিকে স্মৃতিকে যেমন সে সজীব রাখে, অপরদিকে মনকেও তেমনি দান করে সরসতা ও সজীবতা; চিন্তার রোমন্থন ক্রিয়া যেখানে নিরস্ত, চিত্ত সেখানে অতীত জীবনের সহিত সম্পর্ক হারায়, স্মৃতি সেখানে গোপন মনের গহন অন্ধকারে তিল তিল করিয়া অনশন-মৃত্যু বরণ করে।

আভাষ

বেলা শেষের গান

স্মরণ-তীর্থের যাত্রীরূপে অতীত জীবনের আঁকা-বাঁকা দীর্ঘপথ পর্যটন করিয়াছি। চরণ এখন ক্লান্ত ও অবসন্ন, মন পথপ্রান্তে মূরছিয়া পড়িতে চায়, তথাপি বুকের শিরায় শিরায় অনুভব করিতেছি বিগত দিনের দুর্নিবার আকর্ষণ: বিপনিশালার দূরশ্রুত ব্যগ্র কোলাহলের মত কোথা হইতে ও কী কলরব উত্থিত হইতেছে! বিগত দিনের বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাবলী অতীতের অন্ধকার-সমাধি-গহ্বর হইতে সহসা বাহির হইয়া আসিয়া মনের মশান উন্মত্ত তাণ্ডবে মাতাইয়া তুলিল কি! তাহাদের মিশ্র কোলাহলের মধ্যে শুনিতে পাইতেছি, জীবনের যাহা কিছু কাম্য ও রম্য তাহা লাভ করিবার আনন্দ উল্লাস, যাহা পাইয়া হারাইয়াছি তাহার জন্য ক্ষুব্ধ হাহাকার, আজীবন সাধ্য-সাধনা করিয়াও যাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না তাহার জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্খার বুক-ফাটা আর্তনাদ। চলার পথের কাহিনী বলিতে বসিয়া সূচনাতে এই আশঙ্কাই আমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল: মনে হইয়াছিল, সুপ্ত ও সমাহিত স্মৃতির দল যদি যুগপৎ জাগিয়া উঠিয়া একই সঙ্গে আপন আপন বলিবার-কথা কণ্ঠে লইয়া অগ্রসর হইয়া আসে, তাহা হইলে কাহাকে বাদ দিয়া কাহার কথা শুনিব, কাহার মুখে হাত দিয়া কাহাকে কথা কহিবার সুযোগ দিব!

চলার পথের প্রান্তে বসিয়া হট্টমন্দিরের বিপুল অট্টরোল শুনিতেছি আর সান্ত্বনা বোধ করিতেছি এই কথা স্মরণ করিয়া যে, ভাঙ্গা হাটের জীর্ণ চালাঘরের এই যে চীৎকার ইহা নীড়ে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র বিহঙ্গদলের অতিব্যস্ত কল-কোলাহল মাত্র:

অবেলার গোধূলি-ধূসর-ছায়া জীবনের অঙ্গনে নামিয়া আসিতেছে, অচিরে ভবের হাটের বেচা-কেনা বন্ধ হইয়া যাইবে, ক্রেতা ও বিক্রেতার বাদ-বিসম্বাদ নিঃশেষে বিলীন হইয়া যাইবে গভীর নিশীথের জনহীন নিস্তব্ধতায়।

চলার পথের বাঁকে দাঁড়াইয়া আজ মনে হয়, বলার পথের প্রান্তসীমা বুঝি বা দৃষ্টিগোচর, মনে হয়, জীবন-সন্ধ্যার ধুপ-ছায়া রঙের শাড়ীর আঁচলখানি অদূরে ক্ষণে আন্দোলিত হইয়া পরক্ষণে পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। এ লুকোচুরী খেলারও শেষ আছে ঃ সেদিন বোধ হয় আর অধিক দূরবর্তী নয়—যবে সে আঁচল সমগ্র জীবনভূমি আক্রান্ত আচ্ছন্ন করিয়া নীরবে নামিয়া আসিবে ও নিশ্চল শান্তিতে আস্তৃত রহিবে। আলো-ছায়া, সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু ও বিরহ-মিলনে-বিচিত্র এ চলার-পথের প্রতি আজও মর্মে মর্মে গভীর অনুরাগ ও নিবিড় আকর্ষণ পোষণ করি, তাই সে পথ-চলার পালা সহসা শেষ করিতে মন বিমুখ ও বেদনাহত হয়। কিন্তু নিরুপায়—

তবু চলে যেতে হবে ঃ
এই ধরণীর স্নেহ বন্ধন
ব্যথা আনন্দ হাসি ক্রন্দন
হয়তো সোহাগে তখনো আমার চরণে জড়ায়ে রবে,
তবু চলে যেতে হবে !
এই ঋতুচয়, অস্ত-উদয়, মেঘ-রোদ, ছায়া-আলো,
তৃণ-লতা-ফুল, কানন-অটবী সবারে বেসেছি ভালো,
মাথার উপরে ওই রামধনু,
পদতলে এই ধরা শ্যাম-তনু,
জোছনা-আকুল পূর্ণিমা রাতি অমানিশা ঘন কালো,
সবারে বেসেছি ভালো।

অসীমে অ-দেখা পাপিয়ার গান বায়ুভরে ভেসে আসা,
আষাঢ় আকাশে নব মেঘ-ভার চাতকের চির আশা,
কুসুম কলির কমতনুময়
পিয়াসী অলির ভীরু অনুনয়
বাসিয়াছি ভালো— ভালোবাসিয়াছি মানুষের ভালোবাসা।

ওগো উদাসীনা মৃন্ময়ীমাতা, আমারে বিদায় দিতে,
এক ফোঁটা জল নয়নে তোমার ঝরিবে না নিভৃতে!
তোমার আঁখির একটি পলক
তব চিকুরের একটি অলক
নড়িবে না হায় – পড়িবে না কিগো, চমকি আচম্বিতে!

জীবনের চলার-পথের প্রান্তসীমা যত দূরেই হোক না কেন, বাহির পথের বহু বিড়ম্বিত এই তীর্থযাত্রা আজ এইখানেই শেষ করি। না-বলা কথার যে দুর্বহ বোঝা বুকে চাপিয়া রহিল, বিদায় বেলার বিয়োগ-বেদনায় তাহাকে আর ভারাতুর করিয়া তুলিব না। অতীতের যে অতিক্রান্ত দীর্ঘপথরেখা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি, বিরাটকায় অজগরের মত এখনও তাহা আমাকে নিশ্বাসে নিশ্বাসে পশ্চাতে টানিতেছে। জানি, পথের আকর্ষণ জীবন-পথের চির যাযাবর এই মনের কাছে দুর্নিবার; শুধু তাহাই নয়, সে আকর্ষণ যে লোভনীয় তাহাও আমার অজানা নয়; জানি-বলিয়াই তাহার দ্বিধা-আন্দোলিত ছন্দে আজও শুনিতে পাইতেছি প্রস্থান ও অবস্থানের দ্বৈতসঙ্গীত, বাউলের একতারায় বাজিতেছে শুনিতেছি, মিশ্র সেই রাগিনীর অনিশ্চিত আলাপ; শুনিতেছি আর সংশয় আর শঙ্কায় অভিভূত হইয়া ভাবিতেছি—মুসাফির-মন-আমার পাছে রাস্তার ধারে আস্তানা না গাড়িয়া আবার পথে বাহির হইয়া পড়ে:

ওরে ও পান্থ, ক্লান্ত এ' দেহ কেন প্রাণপণে টানা,
কোথা যেতে চাস্—পথের প্রান্তে আছে কি কোথাও থানা ?
গৃহে গৃহে ওই উঠিছে জ্বলিয়া সন্ধ্যা-প্রদীপরাজি,
ওই মঙ্গল শঙ্খ নিনাদ ঘরে ঘরে ওঠে বাজি,
তাহে তোর কিবা ওরে গৃহহীন, ওরে ও আপনহারা,
তুই কেন হেন চলেছিস ছুটি' আকুল পাগল-পারা ?
পথ চেয়ে তোর কুটির দুয়ারে জাগিবে কি কেহ রাতি,
কক্ষে জ্বালিয়া গৃহদীপ আর বক্ষে বাসনা-বাতি ?
আসিছে রাত্রি, হয়তো ঘনাবে ঘোর দুর্যোগ নিশা,
পথ হবে ভুল—স্খলিবে চরণ আঁধারে হারাবি দিশা,
ক্ষান্ত দে আজ, লোটা এইখানে ক্লান্ত অবশ দেহ,
যেদিন যেখানে বেলা শেষ তোর, সেদিন
সেখানে গেহ।
মাথার ওপরে মুক্ত আকাশ তারায় তারায় ভরা,
পদতলে তোর শস্য-শ্যামল স্নেহ-সুশীতল ধরা,
স্বর্গ-মর্ত-দিগ্বলয়ের বাহু বন্ধন ডোরে
চারিধার হ'তে নিবিড় সোহাগে ঘিরিয়া রহিবে তোরে,
ক্ষণকাল পরে কাননে কাননে জ্বলিবে জোনাকীপাঁতি,
দীপান্বিতাতে হবে উজ্জ্বল তোর ঘোর
অমারাতি।
এইখানে ফেল ডেরা—
চুকিয়ে দে আজ রাত্রির মত পথে [illegible]
ঘো[illegible]া।

-শেষ—